প্রথম অধ্যায়
কালকূট ও সমরেশ

বাংলা কথাসাহিত্যের এক শক্তিমান লেখক সমরেশ বসু, যার দ্বিতীয় সত্তা কালকূট। সমরেশ বসু সাহিত্যের অন্য কোনও ক্ষেত্রে নয়, শুধুমাত্র গল্প ও উপন্যাস লিখেই তাঁর সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন—যা তাঁকে একজন প্রথম সারির লেখক হিসেবে মর্যাদা দিয়েছে। এই স্রষ্টার লিখিত রচনা সমগ্রের পরিমাণগত বিশালতা বিস্ময় সৃষ্টিকারী। তিনি বাংলা সাহিত্যে বনস্পতির মতো এক বিশাল প্রতিভা। প্রায় দুশোরও বেশি ছোট গল্পর মধ্যে সমরেশ বসুর লেখা প্রথম গল্পটি হল 'আদাব'। তাঁর লিখিত প্রায় একশোটি উপন্যাসের মধ্যে প্রথমটি হলো 'নয়নপুরের মাটি', প্রকাশকাল (১৯৫২ খ্রীঃ)। যদিও প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত উপন্যাস হলো 'উত্তরঙ্গ' (১৯৫১)। 'মরসুমের একদিন' (১৯৫৩) প্রথম মুদ্রিত গল্প সংকলন। দ্বিতীয় সত্তা কালকূট নামে প্রায় চল্লিশটি ছোট বড়ো রচনার জনক তিনি।

ঢাকা জেলার শুভাড্যা নামক গ্রাম থেকে সমরেশের পিতামহ মহেশচন্দ্র চলে এসেছিলেন বিক্রমপুর এলাকার রাজানগর গ্রামে। সেটা মহেশচন্দ্রের নিজের পিতৃকুলের ভিটে নয়, ওঁর শ্বশুরবাড়ি। যেখানে সমরেশের বাবা মোহিনীমোহনের জন্ম। শুধু বাবা কাকারা নন, ওঁরা সকলেই সেখানে জন্মগ্রহণ করেন। মোহিনীমোহন ছিলেন মহেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ঢাকায় রূপলাল দাসের জমিদারি এস্টেটে কাজ করতেন। তাই সপরিবারে তিনি ওখানেই থাকতেন এবং মাঝে মাঝে রাজানগর গ্রামে আসতেন। তাঁর আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে জ্যেষ্ঠপুত্র মন্মথ নাথকে মামার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করতে হতো। মামার বাড়ির আর্থিক অবস্থা ভালো হওয়ায় তাঁদের মেয়ে শৈবলিনীর সংসারে আর্থিক সাহায্যও আসত। অল্প বয়সে সমরেশের দাদা মন্মথ নাথ রেলের চাকরিতে ঢুকে মাসে মাসে বাড়িতে টাকা পাঠাতেন।

সমরেশের পিতা মোহিনীমোহন ছিলেন বেশ কিছু গুণে গুণবান ব্যক্তি। ভাল গান গাইতে পারতেন, যেমন মালসী গান, শাক্ত গান, কিছু গান আবার রচনাও করতেন। গান ছাড়াও ছবি আঁকার ক্ষেত্রেও তাঁর যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। তিনি অভিনয় করতেও পারতেন। তাঁর এই অভিনয় গুণ পরবর্তীকালে তিন পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। সমরেশের মা শৈবলিনীর

মধ্যে ছিল এক অসাধারণ গুণ। তিনি খুব সুন্দর করে ব্রতকথা বা গল্প বলতে পারতেন। পরবর্তীকালে সমরেশকেও বার বার এই কথা বলতে শুনেছি যে, তাঁর সৃষ্টির মূল প্রেরণা শৈশবে মায়ের কাছে শোনা সেই গল্পের কল্পলোক। সেই বিচিত্র কল্পলোকের বীজ তাঁর মধ্যে বপণ করেছিলেন মা শৈবলিনী। সেই কল্পলোক হল তাঁর ব্রতকথার কাহিনি। মা ছিলেন এক নিপুণ কথাশিল্পী, এক গভীর তদ্‌গত ভাব ছিল তাঁর গল্প বলার মধ্যে। মায়ের প্রসঙ্গে সমরেশ বসু 'নিজেকে জানার জন্যে'- নামক প্রবন্ধে বলেছেন—

> ''সাহিত্যকর্মে প্রবেশের প্রেরণার বিষয়টি প্রথম কীভাবে আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, ঝটিতি এর যা জবাব বা ব্যাখ্যা দিতে পারি তা হবে অনেকটাই মামুলি, কারণ যখন এই উপলব্ধি ঘটলো, আমার ভিতরে একটি বাসনা জাগরিত হচ্ছে, আমি সাহিত্য কর্মে প্রবেশ করতে চাই, প্রকৃতপক্ষে তার অনেক আগেই, শৈশবের অবোধ চিন্তার জগতে, প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল এক কল্পলোক। অজ্ঞানত; তার দাত্রী বা ধাত্রী বলা যায় আমার মা, যাঁর মুখে শুনতাম অভূতপূর্ব সব ব্রতকথার কাহিনী। ... আমার কাছে ব্রতকথার আকর্ষণ ছিল তীব্র, যা আমার মা বলতেন ঢাকা জেলার গ্রাম্য আটপৌরে ভাষায়, যে-ভাষা ছিল স্নিগ্ধ, বলার ভঙ্গিতে থাকতো বিশ্বাসযোগ্য অভিব্যক্তি। ...সেইসব ব্রতকথা ও কাহিনী শৈশবের হৃদয় ও মনকে আচ্ছন্ন করে রাখতো এবং তখনই প্রেরণা বোধ হতো, যার ভাবনা চিন্তার ধরণটা তখন ছিল একেবারেই আলাদা অন্য বন্ধুদের শোনাতে হবে সেই কাহিনী।... একে যদি প্রেরণা বলা যায়, তবে তার পদধ্বনি সেই শৈশবেই বেজেছিল, অবচেতনে, এবং সেইসব ব্রতকথা ও কথকতার মধ্য দিয়ে।''[১]

তাঁর বাবা ও গানের সুরে নানা কথা কাহিনি বলতেন আর পরিবারের বাইরের বিচিত্র জনসমাজের মানুষ এবং বিবিধ ঘটনাও তাঁর লেখার প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। সমরেশ বসু জন্মগ্রহণ করেন ১৯২৪ সালের ১১ ডিসেম্বর ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার রাজানগর গ্রামে। বাবার নাম মোহিনীমোহন বসু, মা শৈবলিনী দেবী। পিতৃদত্ত নাম সুরথনাথ। লেখক হিসেবে যে নামে খ্যাত সেই 'সমরেশ' নামটি দিয়েছেন বন্ধু ও শ্যালক দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। 'ভোটদর্পণ' নামে একটি রাজনৈতিক ফিচার লেখার প্রয়োজনে সমরেশ তাঁর 'কালকূট' ছদ্মনামটি

প্রথম ব্যবহার করেন। এই ছদ্মনামেই অনেক কালজয়ী রচনা পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের পাঠক মহলে সমাদর পায়। এ ছাড়াও, ১৯৭৬ সালে 'প্রসাদ' পত্রিকায় পৌরাণিক পটভূমিকায় রচিত 'অন্তিম প্রণয়' নামক কাহিনিটি লেখার সময় তিনি আরও একটি নতুন ছদ্মনাম ব্যবহার করেন, সেটি হল 'ভ্রমর'। এই ছদ্মনামে তিনি বারোটি গ্রন্থের রচয়িতা।

সমরেশ ছেলেবেলায় ১৯২৮ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত গিরিশ মাস্টারের পাঠশালা এবং পরবর্তীকালে গ্রাণ্ডারিয়া গ্র্যাজুয়েট স্কুলে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। শৈশবের দিনগুলি পার হলেই, বেপরোয়া পুত্রকে তাঁর শঙ্কিত বাবা-মা নৈহাটিতে (১৯৩৯) দাদা মন্মথনাথের কাছে পাঠিয়ে দেন। লেখাপড়া শিখে সমরেশ যাতে স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন এই ছিল তাঁদের অভিপ্রায়। নৈহাটির মহেন্দ্র স্কুলের নথি থেকে জানা যায় যে, সুরথনাথ বসু অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রথাগত শিক্ষার এখানেই সমাপ্তি ঘটেছিল।[২]

নৈহাটি থেকে লেখা পত্রিকা 'বীণা' -বের করতেন। সেখানে শুধু গল্প লেখা নয়, পত্রিকার অনুলেখন, অলঙ্করণ সবই ছিল সমরেশের দায়িত্বে। সমরেশ আট-দশ বছর বয়সেই রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পটি পড়ে একই নামে গল্প লিখে ফেলেন। পাঠ্য বইয়ের চেয়ে অন্য বই তখন বেশি আকর্ষণ করতো। সেই ছেলেবেলা থেকেই তাঁর ঝোঁক ছিল গান, ছবি আঁকা, বাঁশি বাজানো, অভিনয় ইত্যাদির প্রতি। স্কুলের পাঠে একেবারেই মনযোগ ছিল না। তেরো-চোদ্দ বছর বয়সেই সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা শুরু হয়। বাউণ্ডুলে ছেলেদের সঙ্গেই তাঁর বন্ধুত্ব তৈরি হয়। কেউ বয়সে বড়, নেশাখোর কিম্বা ভদ্রসমাজে অপাংক্তেয়। যে কোন নিষিদ্ধ বিষয়েই ওঁর অনুসন্ধিৎসা আর কৌতূহল তৈরি হচ্ছিল। হতাশ মন্মথনাথ সমরেশকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েই আবার তাঁকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেন। কিন্তু কোন শাসন-বন্ধন না মানা কিশোরকে নিয়ে মোহিনীমোহন বিড়ম্বনায় পড়লেন। তিনি অনেক ভেবে ঠিক করে ঢাকার ঢাকেশ্বরী কটন মিলে ট্রেনি হিসেবে ছেলেকে ঢুকিয়ে দেন। কিন্তু প্রকৃতির হাতছানিতে সমরেশ তখন উন্মুক্ত। অতএব কোন শৃঙ্খলার শৃঙ্খল দিয়েই বেধে রাখা মুস্কিল হয়ে ওঠে। মনোমত বন্ধু জুটে যাওয়ায় শুরু হলো কারখানা পালিয়ে ঘুরে বেড়ানো। বুড়িগঙ্গার হাতছানি, রমনা ক্ষেত বা ধানমণ্ডি, দোলাইখালের পুল তাঁকে সবসময় আকর্ষণ করতো। শুধু প্রকৃতিই নয়, মানুষও ছিল তাঁর

আশৈশব আকর্ষণের বিষয়। কারখানার কাজে ফাঁকি দিয়ে তাঁর সহজাত আকর্ষণে সেন্টু নামে একটি কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ছেলেকে নিয়মিত দেখতে যেতে থাকলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছেলেটি মারা গেলে তাঁর বোহিমিয়ান চালচলন যেন আরও প্রকট হয়ে ওঠে। সব দেখে শুনে মোহিনীমোহন আবার সমরেশকে নৈহাটিতে বড়দা-র কাছে পাঠিয়ে দেন।

আবার প্রায় ষোলো বছর বয়সেই তিনি নৈহাটিতে ফিরে এলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল ছবি আঁকা শিখবেন। কিন্তু আর্ট স্কুলে ভর্তি হওয়া হলো না। তিনি আবার 'বাণী' নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা নিয়ে মেতে উঠলেন। পাশাপাশি চলতে থাকে বাঁশি বাজানো, গান, ছবি আঁকা, নারী ও পুরুষের চরিত্রে অভিনয়। ক্রমশ হাতে লেখা পত্রিকায় উনি অপরিহার্য হয়ে উঠলেন। স্থানীয় এলাকায় সব দিক থেকেই নাম করা ছেলে হিসেবে সমরেশ পরিচিত হয়ে ওঠেন। সেই থেকে সমরেশ প্রেম সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠছিলেন। বয়সে বড় অনেকের সঙ্গে মেলামেশার কারণে, তাদের কথা শুনে শুনে অকালপক্কতার পাশাপাশি জীবন সম্পর্কেও জানতে শুরু করেছিলেন। তাঁর এই অস্বাভাবিক জীবন-যাপন ধীরে ধীরে অভিভাবকদের বিব্রত করে তুলল। সতেরো বছর হওয়ার পর থেকে সমরেশের প্রবল আগ্রহ দেখা দিল থিয়েটারে অভিনয় করা, গান-বাজনা করা ইত্যাদিতে। ঢাকায় থাকাকালীন সমরেশের সঙ্গে কাশীনাথ ভট্টাচার্য নামে এক ভদ্রলোকের পরিচয় হয়েছিল। রাজপুরে এই কাশীনাথের অতিথি হয়ে থাকার সময় সমরেশ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলেন, সঙ্গে জণ্ডিস। প্রায় মৃত্যুমুখী অবস্থায় নৈহাটীতে বড়দার কাছে ফিরে আসেন। কিন্তু লেখাপড়ায় অমনোযোগী ভাইয়ের প্রতি বিরক্ত মন্মথনাথ, কিছুটা আর্থিক সংকটের কারণেও যথোপযুক্ত চিকিৎসা করতে পারেন নি। নৈহাটিতে সমরেশের ভালো বন্ধু ছিলেন দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। তার বাড়িতেও সমরেশের যাতায়াত ছিল। বিশেষত হাতে লেখা পত্রিকা, সংস্কৃতিচর্চা ইত্যাদি কারণেই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। দেবশঙ্করের বড়দি গৌরী সমরেশকে স্নেহ করতেন। সমরেশ 'গৌরীদি' বলে ডাকতেন। গৌরী স্বামীর সংসার করতে পারেন নি, স্বামী বিচ্ছিন্না হয়েই বাপের বাড়িতে থাকতেন। সমরেশের এমন মুমূর্ষু অবস্থায় তিনি স্বেচ্ছায় তাকে বাঁচিয়ে তোলার দায় স্বীকার করে, নিজের কিছু গয়না বিক্রির টাকা দিয়ে, ছোট ভাই দেবশঙ্করের সঙ্গে সমরেশকে গাজীপুরে তাঁর মেজ বোনের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। উত্তর প্রদেশের জল হাওয়ার গুণে সমরেশ সুস্থ হয়ে উঠলেন। এই ঘটনার পর থেকেই বয়সে বড় হলেও গৌরীর সঙ্গে তাঁর একটা হৃদয়গত সম্পর্ক গড়ে

উঠল। যা ধীরে ধীরে প্রেমে এবং বিবাহে পরিণতি লাভ করে। পিত্রালয়ের নিম্নবিত্ত সংসারে ক্রমশ জমাটবাঁধা গ্লানি ও নৈরাশ্যে গৌরীও অস্থির হয়ে উঠছিলেন। সমরেশের সান্নিধ্যেই মুক্তির অর্গল খুলে গিয়েছিল। যার ফল স্বরূপ সেই যুগে এক দুঃসাহসিক ঘটনা, ব্রাহ্মণ, বয়সে বড়, স্বামী পরিত্যক্তা এক যুবতীকে নিয়ে ঘর বাঁধার উদ্দেশ্যে দু'জনের গৃহত্যাগ। ছোট ভাইয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা থাকায় মন্মথনাথের পরিবারে ওঁদের আশ্রয় পাওয়ার সম্ভাবনাও থাকল না। অতএব সংসারের জটিল আবর্তে পড়ে সমরেশ সংকটের মুখোমুখি হলেন। এমনি দুঃসাহস আমরা তাঁর জীবনে ও লেখায় বারবার দেখতে পাই। মফস্বলি মধ্যবিত্ত পরিবারের গতানুগতিকতার সীমা লঙ্ঘন করাতেই ছিল তাঁর মুক্তির আস্বাদ। এই মুক্তির খোলা আকাশেই তিনি বরাবর বিচরণ করতে চেয়েছেন। সমরেশের আবাল্য বন্ধু সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, যখন তাঁরা দশম শ্রেণির ছাত্র তখন সমস্ত নৈহাটিকে তোলপাড় করে দিয়ে সমরেশ তার থেকে চার বছরের বড় গৌরীকে নিয়ে আতপুরে চলে গেলেন। সেখানেই শুরু হলো তার সংসার জীবনের অকাল বোধন। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সমরেশ বসু রচনাবলীর' ভূমিকাংশে জানিয়েছেন—

> ''তার জীবনের এই প্রথম নৈহাটিপর্ব কালের বিচারে এক সংক্ষিপ্ত পর্ব। কিন্তু আজ দূরত্বের প্রেক্ষণী ব্যবহার করলে মনে হয় এই পর্ব সারা জীবনের উপক্রমণিকা পর্ব। যে মধ্যবিত্ত জীবনের খোলনলচে কাঠামো এবং ভিত্তিকে সে পরবর্তী জীবনে বারে বারে আক্রমণ করবে, যে বুর্জোয়া বিবাহ ধারণাকে সে তার সাহিত্যে বারে বারে নানা সমালোচনার মুখে ফেলেছে, তার গোড়াপত্তন ঘটেছে এই পর্বে। সে যা কিছু করেছে সারা জীবনে, তার মূল কথা হল কেটে বেরিয়ে পড়া— ঔপনিবেশিকতার দায়ভাগী মধ্যবিত্ত মধ্যচিত্ততার ঘেরাটোপ ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়া।... তাঁর জীবনের এই প্রথম পর্বের প্রধান কথা নিজেকে প্রকাশ করার জন্য এক চঞ্চল উৎকণ্ঠা। তাঁর প্রেম তাঁর জীবনোৎকণ্ঠার এক সংহত মূর্তি। প্রেমের প্রতি দায়িত্ববোধ তাঁকে ঠেলে দিল জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে।''[৩]

আত্মীয়-স্বজন পরিত্যক্ত হয়ে, নৈহাটি ছেড়ে ১৯৪১-এ মাত্র সতেরো বছর বয়সে আতপুরের পুলিশ ফাঁড়ির পিছনে চটকলের আব্দুল মিস্ত্রির বস্তিতে গিয়ে নতুন সংসার পাতলেন সমরেশ ও গৌরী। জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হলো এই আতপুরে। ভাগীরথী সন্নিহিত জগদ্দল-আতপুরের

শ্রমিক অঞ্চলে জীবন ও জীবিকার কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শুরু হলো আত্ম উন্মোচনের পালা। গভীর অনিশ্চয়তায় যখন দিন কাটছে তখন জীবিকা হিসেবে হাতের কাছে পেলেন পোলট্রি ফার্মের ডিম বিক্রির কাজ। ডিম, মুরগী, তরিতরকারী নিয়ে সাহেবদের কোয়ার্টারে গিয়ে মেমসাহেবদের কাছে বিক্রি করতে হতো। মেমসাহেবদের সঙ্গে সেই সময় নিত্য যাতায়াতের দরুণ একরকম নৈকট্য গড়ে ওঠে। ওঁদের কাছে সমরেশ 'ফার্মার বয়' নামে পরিচিত। সে সময় তাঁর একটা অভিজ্ঞতা হয় যে, আর পাঁচটা বাঙালি মেয়েদের মতোই মেমসাহেবরাও স্বামী-সন্তানের কথা অন্যদের সঙ্গে গল্প করেন। কথায় কথায় তাঁরা জানাতেন, স্বামীরা ক্লাবে গিয়ে কী করছেন, কতটা ড্রিঙ্ক করেছেন, কী অত্যাচার, অসদ্ব্যবহার তাঁরা করেন স্ত্রীর প্রতি ইত্যাদি। এই সময় সামান্য এক 'ফার্মার বয়' তাঁদের কাছে যেন কত আপনজন হয়ে উঠতো।

আতপুরে এসে সমরেশের জীবন এক বড় বাঁক নেয়। জগদ্দল আতপুরের শ্রমিক বস্তিতে বসবাস, জীবিকার জন্য লড়াই -এ সব ছিল নৈহাটির দিনযাপনের থেকে বহুলাংশেই আলাদা। সেই সময় সমরেশের সঙ্গে পরিচয় ঘটে জগদ্দলের কমিউনিস্ট পার্টির কিংবদন্তি নেতা সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্ত। একুশ বাইশ বছরের দীর্ঘদেহী, সুদর্শন যুবক। মস্ত পরিবারের ছেলে ও বিলিতি কোম্পানীর বড় চাকুরে। উনি আতপুরে ছাত্রও পড়াতেন, তাই সত্য মাস্টার বলে সবাই ডাকত। পরিচয় হওয়ার ফলে উনি সমরেশকে 'জনযুদ্ধ' পড়তে দেন। সেই সময়টা হলো ১৯৪২ -এর শুরু, 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলন তখনও শুরু হয়নি। দেশব্যাপী উত্তেজনা চলছে, তখনও গান্ধীজি গ্রেপ্তার হননি। সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্ত সমরেশকে ঠিকই চিনেছিলেন। ওনার কাছেই সমরেশের রাজনীতির পাঠ শুরু হয়। উনি ক্রমশ কমিউনিস্ট পার্টির কথা বোঝাতে লাগলেন এবং সমরেশও কমিউনিস্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠতে লাগলেন। সমরেশকে দীক্ষিত করলেন শ্রেণি সংগ্রামের তত্ত্বে—

> ''সত্যমাস্টার আমাকে বোঝালেন, 'জনযুদ্ধ' বিষয়টা কী? ফ্যাসিজম্, সাম্রাজ্যবাদ, সমাজতন্ত্র সোভিয়েত রাশিয়া, অসাধারণ বিশ্বাসযোগ্যতা ও নিপুণতার সঙ্গে তিনি আমাকে বোঝালেন, আমি সর্বান্তঃকরণে তা গ্রহণ করলুম।''[৪]

সমরেশের জীবনে যদি কোনও একজন ব্যক্তির প্রভাব সুদূরপরিণামী হয়ে থাকে তবে তিনি হলেন সত্য মাস্টার। সত্য মাস্টারের চেষ্টাতেই বস্তি থেকে গৌরীকে নিয়ে সমরেশ উঠে

এলেন আতপুরের তরফদার পাড়ায়। সমরেশের হাতের লেখা বেশ সুন্দর দেখে পার্টির পোষ্টার লেখার কাজ যোগাড় করে দিলেন। আতপুর ও জগদ্দল শ্রমিক প্রধান এলাকা, আর সত্য মাষ্টার ছিলেন সেখানকার শ্রমিক নেতা। সেই কারণে সমরেশও শ্রমিক ফন্টে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিল বাঙালি অবাঙালি নির্বিশেষে নারী-পুরুষ কর্মীরা। গৌরীও পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সমরেশকে ছবি আঁকা থেকে লেখালেখির জগতে নিয়ে আসেন তিনিই। সেদিক থেকে বলা যায় সত্য মাস্টারের সঙ্গে সমরেশের সাক্ষাৎ বাংলা সাহিত্যেরই এক মাইল ফলক। সেই সময়ে রাজনীতির জটিল আবর্তের পরিচয় পেতে শুরু করেন সমরেশ। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়—

> ''সত্য মাস্টার যখন সমরেশকে কম্যুনিস্ট পার্টির চৌহদ্দির মধ্যে আকর্ষণ করে নিলেন, তদানীন্তন কালে দুর্লভ পার্টি সদস্যপদ তিনি পেলেন তখন কম্যুনিস্ট পার্টিও পৌঁছে যাচ্ছে রণদিভে তত্ত্বে। কম্যুনিস্ট পার্টিতে যখন পি.সি.জোশী সম্পাদক, তখন সমরেশ লিখেছেন 'আদাব'। যখন রণদিভে থিসিস ধরে পার্টি হয়ে উঠেছে অগ্নিগর্ভ, তখন 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' এর যুগে সমরেশ লিখেছেন 'জলসা'। মাঝখানে কৃষকদের নিজস্ব সংগ্রামের দিনে তিনি লিখেছেন 'প্রতিরোধ'। দেশভাগ, দাঙ্গা, কৃষক বিদ্রোহ, উদ্বাস্তু বিক্ষোভ—এই সমস্ত কিছু তখনকার পার্টি সদস্য সমরেশকে বিচলিত করেছে।''[৫]

সমরেশের সংসারের অভাব অনটন সম্পর্কে সত্য মাস্টার ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে 'ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি'তে ইনস্পেক্টরেট অফ্ স্মল আর্মস্ ডিপার্টমেন্টে ড্রয়িং অফিসে ট্রেসারের কাজে এক টাকা চার আনা আয়ের চাকরি পেলেন। এরপর তিনি আবার তাঁর পুরোনো জীবনে ফিরে যেতে লাগলেন, শুরু হলো হাতে লেখা পত্রিকা বের করার চেষ্টা। এই পত্রিকার চেহারায় দেখা দিল রাজনীতির রং, যা ছিল কম্যুনিজম প্রভাবিত। এই সময় একটু একটু করে লেখায় গভীরতা আসছে, এবং চাকরিও চলছে। ক্রমশ তিনি পত্রিকায় লেখা, পোষ্টার লেখা, ছবি আঁকা ইত্যাদি যাবতীয় কাজের সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে পড়লেন। পত্রিকায় থাকত ফ্যাসি বিরোধী ভাবনা, কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা, চোরাকারবার বিরোধী ও অন্যান্য রাজনৈতিক প্রবন্ধ। এর সঙ্গে সাহিত্যের ওপর প্রবন্ধ লেখা ছাড়াও থাকত প্রগতিশীল গল্প ও কবিতা। পত্রিকা চালানোর

পাশাপাশি 'উদয়ন' নামে লাইব্রেরীও গড়ে তোলেন তাঁরা। যার ফলে পড়াশোনার এক নব দিগন্ত খুলে যায় তাঁর সামনে। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র পড়ার সঙ্গেই চলতে লাগলো মার্কসবাদ নিয়েও পড়াশোনা। বিশ্বের যাবতীয় প্রগতীশীল সাহিত্য এবং বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক লেখার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটলো। নিজের পড়াশোনা সম্বন্ধে সমরেশ লিখেছেন—

> ''আমি রাজনৈতিক কাজ শেষে, রাত্রে লাইব্রেরিতে যেতুম। আমাদের 'উদয়ন' পাঠাগারে বিদ্যুতের আলো ছিল না। হ্যারিকেনের আলো জ্বেলে রাত্রি সাড়ে বারোটা একটা পর্যন্ত পড়াশোনা করতুম।... ওই সময়ে ম্যাকসিম গোর্কি, সোলোকভ, অস্ট্রোভস্‌কি, ইলিয়া এহরেনবুর্গ, এরিক মারিয়া রেমার্কে, লু-শুন, লাও চাও এঁদের লেখা যেমন পড়তুম, তেমনি মানিক, তারাশঙ্কর, সুবোধ ঘোষ, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাও পড়তুম। প্রেমেন মিত্রও আমার অবশ্য পাঠ্য গল্প লেখক ছিলেন। বরং আরো আগের, আমার পাঠক মনকে যাঁরা অভিভূত করে রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ প্রায় পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। তাঁর স্থান নিতে টলস্টয়ও আসেননি। বরং চেকভ এসেছিলেন তাঁর অসাধারণ চিমটিকাটা বক্রভাষী আর চোখটেপা গল্পের থলি নিয়ে। এসেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র, মুন্সী প্রেমচন্দ।''[৬]

শুধু পড়া নয় সাহিত্য আলোচনাও হত। সমরেশ লিখেছেন—''ভাটপাড়ার চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য, সিতাংশু ভট্টাচার্য, মাস্টার মশাই এঁদের সঙ্গে আমার সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হতো।''[৭] আর এ প্রসঙ্গে তিনি নিজের ভবিষ্যত যাত্রা পথের কথা লিখেছেন—''তখনো বুঝতে পারিনি, আমার ভবিষ্যতের যাত্রাপথ তৈরি হচ্ছিল।''[৮] ১৯৪৪ -এর মাঝামাঝি তিনি পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। এই কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসার পরেই সমরেশের চারপাশের জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে দৃষ্টি সজাগ হয়। অভিজ্ঞতার প্রসার ঘটে। নিজের দারিদ্র, দরিদ্র দুঃখী মানুষ সম্পর্কে তাঁর এক আত্মিক চেতনা গড়ে ওঠে। ক্রমশ ভেতরে জেগে ওঠে সর্বস্ব ত্যাগের প্রেরণা।

গোপাল হালদার, নীরেন রায়, হিরণ সান্যাল, অমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিখ্যাত সব কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী লেখক কবিদের সঙ্গে সমরেশের পরিচয় ঘটলো। এঁদের সকলের সান্নিধ্য তাঁর চিন্তার জগত ও দৃষ্টিকে নতুন চেতনায় দেখার উদারতা ও সীমাকে সুদূর ও বিস্তৃত করে দিয়েছিল। তবে সন্তানদের মানুষ করার জন্য ও নিজেদের ভরণপোষণের জন্য চাকরিটা ছিল আবশ্যিক।

কিন্তু জীবনটাকে ঘিরে ছিল পার্টি। একদিকে ছিল প্রাত্যহিক রাজনৈতিক সাংগঠনিক বিষয়ে কাজ আর অন্যদিকে লেখা ও পড়া। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত চাকরি করে, বাড়ি ফিরে কারখানার পোশাক বদলে হয় জগদ্দলে পার্টি অফিসে, নয় তো ইউনিয়ন অফিসে। মূলত কাজ ছিল অবাঙালি কমরেডদের সঙ্গে বস্তিতে বস্তিতে গিয়ে সামাজিক ভাবে মেশা ও রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। বোঝাবার চেষ্টা করতেন, লালঝাণ্ডা পার্টি শ্রমিক পার্টি, তারই পতাকাতলে শ্রমিকদের সামিল হতে হবে অস্তিত্বের সংগ্রামের জন্য। ব্রিটিশ ও দেশীয় ধনী শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে থাকা ও ক্রমাগত শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমিক রাজ স্থাপন করাই ছিল পার্টির অন্যতম লক্ষ। এর প্রভাব সমরেশ বসুর জীবনে গভীর ভাবেই পড়েছিল। তাঁর ভাষায়—

> ''আমার জীবনে এ সব অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে বিশেষ কাজে লেগেছে। আমি রাজনীতি করার সঙ্গে সঙ্গে, চটকলের শ্রমিক চরিত্রগুলো, তাদের চিন্তাভাবনা, জীবনযাপন, জীবনের লক্ষ্য, সবই আমাকে অনেক কিছু দেখিয়েছে, আমি কয়েক পুরুষের দক্ষ শ্রমিকদের দেখেছি। বাঙালি মিস্তিরিদের মধ্যবিত্ত মানসিকতা লক্ষ্য করেছি।''[৯]

১৯৪৬ সাল যখন কিনা বেঁচে থাকার দুর্নিবার সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছেন সমরেশ, সেই সময় সারা দেশ জুড়ে চলছে দাঙ্গা পরবর্তী হিংস্র হানাহানি। সাধারণ মানুষের মনে তখন সন্দেহের বিষবাষ্প। ঘাতকের উদ্যত ছুরিকার ভয়ে সন্ত্রস্ত গোটা জাতি। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে মধ্যাহ্নেও নেমে এসেছে অন্ধকারের করাল ছায়া। ছেচল্লিশ সালে 'উদয়ন' পত্রিকার জন্য লেখা 'আদাব' গল্পটি ওঁর বন্ধু গৌর ঘোষ প্রায় জোর করেই 'পরিচয়' এ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যদিও এর আগেই 'শেষ সর্দার' নামে একটি ছোটগল্প 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। একটি নাটকও সেই সময় লিখেছিলেন। তিন অঙ্কের 'লেবার অফিসার' নামের নাটক। সেটি আই.পি.টি এর বিভিন্ন শাখায় অভিনয়ও হয়েছে। যাইহোক শারদীয় সংখ্যায় 'পরিচয়' মাসিক পত্রিকায় 'আদাব' (১৯৪৬) গল্পটি প্রকাশের পরেই সাড়া পড়ে গিয়েছিল সাহিত্যের পাঠক মহলে। এরপর পরিচয় থেকে আর একটি গল্প চাওয়া হলে নতুন লেখকের অতি উদ্দীপনায় সমরেশ সঙ্গে সঙ্গে যে গল্পটি পাঠান, তা ফেরৎ আসে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলে পাঠান এই লেখাটি লেখকের প্রথম গল্পটির সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে পারবে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মতামত সেদিনের সেই নতুন লেখককে কৃতজ্ঞ করে তোলার

পাশাপাশি দৃষ্টি ও চিন্তাকে সজাগ করে তুলেছিল। সমরেশের ভাবনায়—

> ''জিজ্ঞাসু করেছিল ভাবনাকে দূরবগাহী কিন্তু বিসর্পিল যার গতি; এই ভাব ঐশ্বর্যের মহিমার পিছনে আমি এখনো ছুটে চলেছি, কারণ এই একটি অমনোনয়নই চিহ্নিত করে দিয়েছে, আমার সারা জীবনের অমনোনয়নের, যুগপৎ বিষাদ ও উদ্দীপনাকে। অমনোনয়ন এখন আমার নিজের ভিতর থেকেই উৎসারিত, আদ্যন্ত আমার রচনা ও ব্যক্তি মানসিকতার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। এই নিরন্তর দ্বন্দ্বের মধ্যে আমি বাঁচি। পথের ঐকান্তিক মোক্ষ, অতএব কোথায়? সন্ধান মেলেনি অদ্যাপি।''[১০]

১৯২৪ থেকে ১৯৪৬ তাঁর সাহিত্যচেতনা উন্মেষের পর্ব। সমরেশ বসুর উল্লেখযোগ্য গল্প 'আদাব' প্রকাশিত হল ১৯৪৬ সালে। চল্লিশের দশক আমাদের জীবনে সবদিক থেকেই যুগান্তরের বার্তাবাহী। রাজনৈতিক আন্দোলন, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সামাজিক স্থিতিশীলতার বিনষ্টি রাজনৈতিক আন্দোলন, মন্বন্তর, ৪৬-এর দাঙ্গা, দেশভাগ, সবদিক থেকে এ দশক এক বিপর্যয়ের কাল। তারই ভিতর দিয়ে আসে স্বাধীনতা। কিন্তু এই খণ্ডিত স্বাধীনতাকে সকলে মেনে নিতে পারেনি। সমরেশও এই খণ্ডিত স্বাধীনতা স্বীকার করতে পারেননি ১৯৪৭ এর ১৫ আগষ্ট রাত্রে তাঁরা তিন বন্ধু মিলে পূর্ব পাকিস্তান দেখতে চলেগিয়েছিলেন। তিনি বলছেন—

> ''আমরা তিন বন্ধু কেউই অন্তর থেকে দেশ বিভাগ মেনে নিতে পারেনি।''[১১]

সমরেশ বসুর শিল্পী সত্তাটি পূর্ণ রূপে জানতে হলে চল্লিশের দশককে ও সেই সময়কে বুঝতে হবে। যুগপরিবর্তনের উত্তাপ-গ্লানি-যন্ত্রণা তাঁকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। যা তাঁর শিল্পীচেতনার নির্মিতিতে যুগভিজ্ঞতার উত্তরাধিকার স্বরূপ।

বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা অর্জন করা পর্যন্ত ভারতবর্ষ তথা বাংলার সমাজ ইতিহাস, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এক সুবিস্তৃত পটভূমির সঙ্গে জড়িত রয়েছে। এই সময়ে জাতীয় জীবনচেতনার প্রধান উদ্দীপক হিসেবে কাজ করেছে পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রাম। এর সঙ্গে যোগ হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-'১৯), রাশিয়ার বিপ্লব (১৯১৭), পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট (১৯২৮-'৩১), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-'৪৫)-এর মতো আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলি। তৎকালীন সময়ে পৃথিবীর অন্যতম প্রভাবশালী শক্তি ব্রিটেনের উপনিবেশ হিসাবেই আন্তর্জাতিক ঘটনার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয়েছিল। ইংরেজদের শাসনাধীন একটি প্রধান উপনিবেশ হিসাবেই ভারতের রাজনৈতিক ও

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। এই প্রভাব শেষ পর্যন্ত আমাদের সমাজ-ইতিহাসের রূপান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

চল্লিশের দশকে প্রধানত সমরকালীন লেখকদের আবির্ভাব ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার নানা প্রকার জাতীয় বিপর্যয় তাঁদের উদ্বেল করে তুলেছিল। ফ্যাসিবাদের উত্থান ছিল তখন সব চিন্তাশীল মানুষের কাছে বিপজ্জনক প্রবণতা। সেজন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের রাজনীতিবিদরা ইংরেজকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজদের রাজনীতি তখন গণতান্ত্রিক মানসিকতা ছেড়ে আগ্রাসী উপনিবেশিকতাকে আশ্রয় করেছে। যুদ্ধের সময়কার অর্থনৈতিক সংকট তখন ভারতবর্ষের মানুষের দৈনন্দিন যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠেছে। জাপানী বোমাবর্ষণের ভয়ে ব্ল্যাক আউট কলকাতার নিত্য সঙ্গী। ৪২ এর উত্তাল আন্দোলনের অভিঘাত থিতিয়ে পড়তে না পড়তেই এল ৪৩ এর মন্বন্তর। কতো মানুষের মৃত্যু হল তার লেখা জোখা নেই। ইংরেজ সরকারের উদাসীনতায় এই মন্বন্তরের করাল গ্রাসে বাংলা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। তার নৈতিকতা বিধ্বস্ত হয়ে গেল। এর রেশ কাটতে না কাটতেই এল ৪৬ এর দাঙ্গা। এও রাজনীতির চাল। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ ঘটানো ছিল ইংরেজ রাষ্ট্রতন্ত্রের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। এখন তারই ফলে রক্তাক্ত ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা ঘটল। এরপর এল স্বাধীনতা ও দেশভাগ। এই সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অভিঘাতে যেমন সাধারণ মানুষের জীবনচেতনার আমূল পরিবর্তন ঘটল তেমনি লেখকদের মধ্যেও দেখা গেল এই নূতন কালের মানুষের কথা বলবার আগ্রহ। এই সময়কার লেখকেরা মনুষ্য সৃষ্ট সংকটকে, কালো বাজারীকে এবং সাধারণ মানুষের জীবন ধারণের সমস্যাকে অত্যন্ত পারদর্শিতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন সামাজিক মানুষের সংকটের কথা। সুবোধ ঘোষ লিখেছেন মধ্যবিত্তের সংকট অসহায়তা এবং তার মানসিকতার সমস্যা। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী মানুষের জটিল মনস্তত্ত্বের চেহারাকে গল্প উপন্যাসে ধরতে চেষ্টা করেছেন। এছাড়াও এইরকম টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যে অন্য যে সমস্ত সমরকালীন সাহিত্যিকরা কলম ধরেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন—নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী, বিমল কর, নবেন্দু ঘোষ, সমরেশ বসু, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বারীন্দ্রনাথ দাশ প্রমুখ। উল্লিখিত লেখকদের জন্ম প্রায় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি। এঁরা যখন তরুণ বয়সে পদার্পণ করেন তখনি বঙ্গদেশের পালে বিপর্যয় আর অবক্ষয়ের হাওয়া লেগেছে। তাঁদের চোখের সামনে শুরু হয় ভাঙন।

এইসব সমরকালীন তরুণ উপন্যাস লেখকদের সামনে যে সমস্ত ঔপন্যাসিক আদর্শরূপে ছিলেন, তাঁরা হলেন তারাশংকর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। তরুণ উপন্যাস লেখকদের ওপর যে দু'জন লেখকের প্রভাব সব থেকে বেশি কার্যকরী ছিল তাঁরা হলেন—তারাশংকর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'লেখকের কথা' প্রবন্ধে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উক্তি তরুণচিত্তে ভীষণ প্রভাব বিস্তার করেছিল, যথা—

> ''জীবনকে তো জানতেই হবে, এ বিষয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু জীবনকে জানাই যথেষ্ট নয়। সাহিত্য কি এবং কেন সে তত্ত্ব শেখাও যথেষ্ট নয়। যে জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছি বুঝেছি সেই জীবনটাই সাহিত্যে কীভাবে কতখানি রূপায়িত হয়েছে এবং হচ্ছে সেটাও সাহিত্যিককে স্পষ্টভাবে জানতে ও বুঝতে হবে, নইলে নতুন সৃষ্টির প্রেরণাও জাগবে না, পথও মুক্ত হবে না।''[১২]

দ্বিতীয় বিশ্ব সমর (১৯৩৯) ও এর পরবর্তী পাঁচ বছর (১৯৪৫-১৯৫০) ছিল দুনিয়াব্যাপী আলোড়ন ও পালাবদলের সময়। এই আলোড়ন ও বিপর্যয় প্রভাবিত করেছিল জীবনের সর্বক্ষেত্রকে। সমরক্লান্ত দুনিয়ার চাঞ্চল্য যেমন ভারতবাসীকে উত্তেজিত করেছিল, তেমনি রক্তাক্ত স্বাধীনতাও আলোড়ন তুলেছিল। তরুণ ঔপন্যাসিক গোষ্ঠীও এই সমস্ত পরিবর্তন, চাঞ্চল্য, অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও আশা-স্বপ্নের দ্বারা উদ্বেলিত, বিপর্যস্ত ও উদ্দীপ্ত হয়েছিল। সুতরাং এঁদের উপন্যাসের আলোচনা করতে হলে প্রথমে এই জাগতিক পটভূমিকে মনে রাখতে হবে। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কালের প্রতিমা'য় উল্লেখ করেন—

> ''একালের উপন্যাসে চরিত্রের আত্ম-সমীক্ষা প্রধান হয়ে উঠেছে। স্বীকারোক্তি (কনফেশ্যান) আর অন্বেষণের (ডিটেকশ্যন) মাধ্যমে চরিত্র জীবন সম্পর্কে সত্য উপলব্ধিতে পৌঁছতে চায়। দস্তয়েফস্কির 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট' উপন্যাসে স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাসের সূচনা। পাপবোধ, শাস্তি, স্বীকারোক্তি ও আত্মশুদ্ধির পথ দস্তয়েফস্কি 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট' -এ প্রথম দেখিয়েছেন। রাসকলনিকফ -এর পাপবোধ ও পাপমুক্তির ব্যাকুলতা এমন সর্বজনীন রূপ পেয়েছে যে পাঠকমাত্রই রাসকলনিকফ -এর যন্ত্রণার অংশীদার হয়। ...

> একালের উপন্যাসের আর এক পদ্ধতি —জীবন সত্যের অন্বেষণ (ডিটেকশান)। আলব্যার কাম্যু-র 'দ্য আউসাইডার' 'দ্য স্ট্রেঞ্জার' উপন্যাসটি এই পদ্ধতির অন্যতম প্রবর্তক।"[১৩]

সমরকালীন লেখকদের উপন্যাসে জীবন সত্যের অন্বেষণ হলো মূল লক্ষ্য।

তিরিশের দশকে সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা একদিকে যেমন শরৎচন্দ্রের সীমাবদ্ধতাকে উপলব্ধি করেছিলেন তেমনি কল্লোলের সাহসিকতাকেও গ্রহণ করেছিলেন অনিবার্যভাবে। ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী তথা কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে উৎপাটিত মানুষের দল যেখানে পুঁজিবাদী তথা যন্ত্রশিল্প প্রধান সমাজে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, ব্যক্তি ও সমাজের সংঘর্ষের এই ছবি তাঁর আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। এমনকি সামন্তবাদী সমাজের সদর্থক দিকও তিনি আলোচনায় এনেছেন। 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'—এই বিশ্বাস তারাশঙ্করের সত্তার মধ্যে অটুট ছিল। মানুষের অন্তর্প্রবৃত্তির সফল রূপকার তিনি। সমস্ত মানুষের মনে যে প্রবৃত্তির তাড়না তাকে তিনি নানা গল্পে রূপ দিয়েছেন। এই প্রবৃত্তির টান মানুষকে অকল্যাণের পথে নিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত যাকে নষ্ট হতে দেয় না। তার লেখার মানুষেরা জীবনের নানা দুর্লভ পরিস্থিতির মধ্যেও দাঁড়িয়ে নিজের সেই সত্তাকে খোঁজে। কিন্তু তারাশঙ্কর মনে করেন, মানুষ বিশ্বাস খুঁজে পায় তার অন্তরে। বাস্তব ব্যবস্থার সঙ্গে সংঘর্ষে তার বিশ্বাসেরই শুদ্ধি ঘটে। তারাশঙ্করের প্রথম দিকের লেখায় সমাজের দুই শক্তির দ্বন্দ্ব এবং ভাঙন ও নতুন প্রতিষ্ঠার গল্প। কিন্তু 'আরোগ্য নিকেতনে'র মতো লেখায় উঠে আসে মহৎ এক উপলব্ধির কথা। তাঁর 'কবি' উপন্যাসের নিতাই এর কণ্ঠে বাজে একটি মহৎ জীবন চেতনার সুর—'হায় জীবন এত ছোট কেনে।' তারাশঙ্করের লেখায় বিভূতিভূষণের মতো প্রত্যক্ষ ঈশ্বর চেতনার কথা কম কিন্তু জীবনের বহুদর্শিতা বহু বিচিত্র মানুষের জীবনসন্ধানের বিস্তার এবং তার শেষে এক গভীর উপলব্ধি-সেও যেন ঈশ্বর উপলব্ধির মতো-কিন্তু তা নয়—সেই মহৎ উপলব্ধির সাক্ষাৎ ঘটে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা হল। যথা—

> ''তিরিশের বুদ্ধি-জগতে জীবনের সার্বিক সংকটের স্বীকৃতি যেমন স্পষ্ট, সেই সংকটকে শিল্প সৃষ্টিতে পরিহার না করার দৃঢ়তাও তেমনি লক্ষণীয়। এই দৃঢ়তার মূলে ছিল জীবন সম্বন্ধে প্রবল আশা। ভারতবর্ষে এই আশার চেহারা গড়ে

উঠেছিল উপনিবেশের বন্ধন মুক্তির স্বপ্নে।... তিরিশের উপ্যনাসিকবৃন্দ তাঁদের উপন্যাসের বিষয় নির্বাচনে ও শিল্পপ্রয়াসে অনেক বেশী সমগ্রসন্ধানী দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।"[১৪]

তিরিশের দশকের আর একজন ঔপন্যাসিক হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও ছিলেন তারাশঙ্করের মতো গ্রামীণ জীবনের রূপকার। কিন্তু একই সময়ের মানুষ হয়েও দুজনের মধ্যে কতো না পার্থক্য। তারাশঙ্কর গ্রামীণ মানুষের জীবন বর্ণনার মধ্যে জীবনের সত্যকে খুঁজেছেন। জীবনের উন্মত্ত প্রবৃত্তির প্রবল টানে দ্বন্দ্ব বিক্ষত মানুষ তারাশঙ্করের বিষয় অন্য পক্ষে বিভূতিভূষণ মানুষ ও প্রকৃতির একটা সহজ সম্পর্ক আবিষ্কার করলেন। প্রকৃতির তুচ্ছতম বস্তু থেকে বিরাট মহাকাশের গভীর রহস্য পর্যন্ত সবই মানব জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার আশ্বাস তাঁর লেখায়। প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের লেখার একটা মাত্রা, বিভূতিভূষণ সেই মাত্রাকেই তার অভিজ্ঞতার আশ্রয় করেছেন। বিভূতিভূষণের লেখায় উঠে এসেছে অতি তুচ্ছ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কথা। আর তার সঙ্গে মিশে গেছে প্রকৃতির অতি জীবন্ত চিত্র রচনা। তাঁর মানুষেরা প্রকৃতির সান্নিধ্যে মিলেমিশে এক হয়ে বেড়ে ওঠে। তাঁর কাছে প্রকৃতি জীবনের পরিপূরক। রবীন্দ্রনাথের, 'কাছের জিনিসের ও যে পরিচয় বাকি থাকে বিভূতিভূষণ তাকেই দেখালেন তাঁর গল্প উপন্যাসে। প্রতিনিয়ত যে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা নিয়ে জগৎ ও জীবনকে দেখতে আমরা অভ্যস্ত, অথচ কোন কিছু বিশেষ ভাবে মনে রাখার চেষ্টা করি না বা তেমন করে বিস্ময় বোধ করি না বিভূতিভূষণ সেই জগতেই সন্ধান করেছেন তাঁর সাহিত্যের উপাদান।

তারাশঙ্করের সমসাময়িক কালের হয়েও রচনায় ভিন্নতর স্বাদ ও বৈচিত্র্যের জন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্য জগতে একটি বিশেষ স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসের ধারাকে এগিয়ে দিলেন, সাহিত্যে সমাজবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের মধ্য দিয়ে। সমসাময়িক জীবনের সমস্ত জটিলতাকে বিচার বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লেষণ করে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে ব্যক্তির অবস্থানগত যে চিত্রটি তুলে নিয়ে এলেন, তা ব্যক্তি ও সমাজের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করলো। 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর'-এ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা হলো। যথা—

''তিরিশের কাল বাঙালি মধ্যবিত্তের এই উপলব্ধির কাল যে, এই মধ্যবিত্তের

> ক্ষণস্থায়ী স্বর্ণযুগের অবসান ঘটেছে, গ্রামীণ মধ্যবিত্তের এই জীবন রঙ্গমঞ্চে যবনিকা দুলছে, নতুন পালা নতুন করে বাঁধতে হবে। এই সময় এই তিনজন ঔপন্যাসিক তিন রকমভাবে বাঙালি মধ্যবিত্তের কাছে অস্তিত্বের ভাষ্য ও বেঁচে থাকার মানে খুঁজে দেবার চেষ্টা করেছেন। অথচ তিনজনের মধ্যে একই সঙ্গে কাজ করেছে একটা বোধ, যার মূল কথা হল সঙ্কট। তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন একটা শ্রেণীর সঙ্কট, বিভূতিভূষণ দেখিয়েছেন একটা অনুভূতির সঙ্কট, মানিক দেখিয়েছেন ব্যক্তির সঙ্কট অথবা জটিলতা। তারাশঙ্করের ইতিহাসবোধ, বিভূতিভূষণের প্রকৃতিবোধ ও মানিকের সমাজবোধ সেই জটিলতার ওপর আলো ফেলেছে।"[১৫]

তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিখ্যাত তিনজন ঔপ্যনাসিকের দ্বারা অঙ্কিত সমাজসত্য ও জীবনশিল্পকে সমরেশ আত্মীকরণ করে সাহিত্যে পদার্পণ করেছিলেন। এর সঙ্গে যোগ হয় নিজস্ব জীবন দৃষ্টিভঙ্গি এবং শৈল্পিক মনোভাব। যা তাঁকে স্বতন্ত্র শিল্পীব্যক্তিত্বে চিহ্নিত করেছে। তাঁর জীবন পর্যবেক্ষণের বলিষ্ঠতা, দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা, সমাজ সত্যকে তুলে ধরা, তির্যক মনোভঙ্গি এবং সর্বোপরি মানুষের কথাকার হিসাবে তিনি অনন্য।

চল্লিশের দশকে লেখকদের রচনায় ব্যক্তিজীবনের বিনষ্টিতে সমাজ পরিবেশের প্রত্যক্ষ দায়িত্বটি অঙ্কিত হলো। বিরুদ্ধ পরিবেশের কাছে অসহায় ব্যক্তির ক্রন্দনকেও তাঁরা ফুটিয়ে তুললেন। আবার ব্যক্তির জীবনের অনন্ত সম্ভাবনার কথাও তাঁদের কলমে চিত্রিত হয়ে ওঠে। প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ কাঠামোর বিরুদ্ধে ব্যক্তির যৌথ সংগ্রামচিত্র চল্লিশের বাংলা উপন্যাসগুলিতে বেশি করে উপলব্ধ হয়। সমাজজীবনের এই সর্বাঙ্গীন আলোড়নকে পশ্চাদপটে রেখে সমরেশ সাহিত্য সৃষ্টির পথে পা বাড়িয়েছেন। এর সঙ্গে জড়িত ছিল সাহিত্যিকের জাগ্রত শুভচেতনাবোধ। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪৬)-যা '৪৬-এর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সেটাকে কেন্দ্র করে রচিত তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'আদাব' (১৯৪৬), পরিচয়, শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশ। গল্প থেকে শুরু হয় তাঁর উপন্যাসের দিকে পথ চলা। প্রথম উপন্যাস 'নয়নপুরের মাটি' (১৯৪৫) লিখেছিলেন অস্ত্র কারখানার নক্শা ঘরে বসে, একুশ বছর বয়সে। যদিও উপন্যাসটি প্রকাশ হয় অনেক পরে। সমরেশের 'আদাব' গল্পের পটভূমি ঢাকা, সংলাপেও ওখানকার স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করা হয়। প্রধান দুটি চরিত্র একজন শ্রমিক,

অন্যজন নৌকার মাঝি। একজন হিন্দু ও অন্যজন মুসলমান। দাঙ্গাবিক্ষুব্ধ ভারতের এক সংকটাপন্ন মুহূর্তকে গল্পে রূপায়ন করেন। তাঁর প্রথম রচিত গল্প 'আদাব'-ই চিনিয়ে দেয় প্রতিভাবান লেখককে। এরপর 'পরিচয়'-এ পাঠালেন তেভাগা আন্দোলনের ওপর লেখা এক স্পর্ধিত জাগরণের গল্প 'প্রতিরোধ'। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'প্রতিরোধ' -এ 'আদাব' -এর মতো সংহতি নেই, কিন্তু এটা বোঝা যায়, ও নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কথা বলছে। ধীরে ধীরে 'পরিচয়' এর সঙ্গে সমরেশ বসুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উনি ঐ পত্রিকায় পরপর গল্প লিখতে লাগলেন।

এরই মধ্যে সাতচল্লিশের পটভূমিকায় ঘটে যায় নানা রাজনৈতিক পট পরিবর্তন। বাংলাদেশ তার অখণ্ডতাকে হারিয়ে পরিণত হলো খণ্ডিত পশ্চিম বাংলায়। 'প্রসঙ্গ ভারতীয় কমিউনিস্ট (অখণ্ড) পার্টি ও আমি' প্রবন্ধে সমরেশ জানান—

> ''এলো স্বাধীনতা আর দেশ বিভাগ। দেশ বিভাগ আমি অন্তর থেকে কোনো কালেই মেনে নিতে পারিনি। মাস্টার মশাই অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরী, বীরেন ঘোষও বুঝিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে তর্ক করার যোগ্যতা বা মানসিকতা, কোনোটাই আমার ছিল না। এ ব্যাপারটি অন্তর গ্রহণ করেনি। মহাত্মাই ছিলেন আমার অন্তরের একমাত্র 'আশ্রয়'।''[১৬]

লেখালেখির মাধ্যমে কিছুটা পরিচিতি এলেও সমরেশ তখনও কাজ করতেন ইছাপুর রাইফেলসের কারখানায়। সঙ্গে চলতো নানা রকমের রাজনৈতিক কাজকর্ম। সশস্ত্র বিপ্লবে আস্থা না থাকা সত্ত্বেও সমরেশকে পার্টির নির্দেশে ধর্মঘট মানতে কারখানার সামনে হাতে বোমা নিয়ে যেতে হতো। দলের সাংগঠনিক কাজ ওঁকে করতে হতো পাট কলগুলিতে সেখানকার শ্রমিকদের সঙ্গে। প্রধানত অবাঙালি কমরেডদের সঙ্গে বস্তিতে গিয়ে সামাজিক ভাবে মেলামেশা ও রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করতে হত। লালঝাণ্ডা পার্টি যে শ্রমিক শ্রেণির পার্টি, তারই পতাকা তলে শ্রমিকদের সামিল হতে হবে—এসব কথা বোঝাতে হত।[১৭]

কিন্তু পার্টির মধ্যেও হাওয়া বদল হচ্ছিল। সমরেশ যাকে ভারতীয় কমিউনিস্টদের 'স্বর্ণযুগ' বলেছেন সেই যুগের পরিবর্তন ঘটছিল। তিনি লিখেছেন—

> ''তারপরেই এলো সেই সংকটের সময়। উনিশশো আটচল্লিশ সালের সঠিক সময়টা মনে করতে পারছিনে।... পার্টির নেতৃত্ব বদল হল। নতুন নীতি আমদানি

হল 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়।' ভারতের নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্তিকে পার্টি অস্বীকার করলো, এবং একই সঙ্গে পার্টির অভ্যন্তরে নতুন নীতির ব্যাখ্যা করা হল, সশস্ত্র বিপ্লবের পথে যাত্রা। আমাদের নতুন নেতা তখন হলেন কমরেড বিটি রণাদিভে। পি.শি. জোশী চিরদিনের মতো অন্তরালে চলে গেলেন।"[১৮]

সমরেশ বসুর লেখা থেকে দেখতে পাচ্ছি পার্টির পুরানো রীতি নীতি বদলে গেছে। সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলছেন যাঁরা, তাঁরা নতুন নেতা। তারা বলছেন—

''আগের দিনের কথা ভুলে যাও।... সশস্ত্র বিপ্লব, পুলিশের বিরুদ্ধে মুখোমুখি লড়াই আর নিজের জান কবুল করার জন্য সবাই প্রস্তুত হও।"[১৯]

সমরেশ লিখেছেন এই সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য মানুষ তখন প্রস্তুত নয়। সমরেশ ও এ পথ সমর্থন করেননি। তিনি বলেছিলেন—'কমিউনিস্ট সশস্ত্র বিপ্লবের নামে, পার্টি সন্ত্রাসবাদী পথে চলেছে'।

পার্টির নেতারা ক্রমশ খবর পাচ্ছিলেন, সমরেশ পার্টির লাইনকে সমর্থন করছেন না। সমরেশের সঙ্গে এই নিয়ে পার্টির মধ্যে বিরোধেরও সূত্রপাত ঘটে। সমরেশ দেখলেন, পার্টির সশস্ত্র লাইন শ্রমিকরা সমর্থন করছে না বরং তারা পার্টির একনিষ্ঠ কমরেডদের গালাগালি দেয়। তখন পার্টির ভেতরেই তৈরি হচ্ছিল পার্টির শত্রু। যাদের প্রভাবে আদর্শবান সৎ নেতাদেরও অনেক নীচে নামিয়ে দেওয়া হয়। এরা জনসাধারণকেও তেমন ভাবে চিনতো না। এমনি এক ধূর্ত নেতা শান্তি মুখার্জির চক্রান্তে পার্টির নিষ্ঠাশীল নেতা সত্য মাস্টারের প্রাণ যায়। সমরেশ লিখিত 'মানুষ' গল্পে এই মর্মন্তুদ ঘটনার চিত্র আমরা পাই। সমরেশ পার্টির মধ্যে অকপটে নিজের চিন্তা ভাবনা ব্যক্ত করতেন। এরপর দেখা গেল সমস্ত অঞ্চলভিত্তিক নেতাদের জেলে ভরে দেওয়া হচ্ছে। ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হল এবং গোটা পার্টি মেশিনারি আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে গেল, ওপরতলা থেকে নতুন নতুন নির্দেশ পাঠাতে লাগলো। পার্টির তখনকার নেতা শান্তি মুখার্জীর চক্রান্তে সত্য মাস্টার মারা যান। নিত্যনন্দ চৌধুরী পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। সমরেশের 'যুগ যুগ জীয়ে' নামক উপন্যাসটির মধ্যে যেভাবে পার্টির লোকেরা চক্রান্ত করে ত্রিদিবেশকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল, বাস্তবে সমরেশের সঙ্গে ঠিক একই ঘটনা ঘটে। সেই রাত্রেই পুলিশ ধরে নিয়ে যায়, লালবাজারে দু'দিন রাখার পর লর্ড সিন্‌হা রোডে এস.বি. সেলের নরকে এক সপ্তাহের জন্য চালান করা হয়। সেখানেই

রোজ ছ' থেকে আট ঘন্টা বিভিন্ন এস. বি. অফিসার তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতো। তারপর তাঁকে প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠানো হয়। প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠাবার আগে এস.বি. সেলে যে সাতটা দিন সমরেশ ছিলেন, সেই সময়কার দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন তাঁর জীবনে একটা স্থায়ী দাগ কেটে দেয়। আলো ও বাতাসহীন পরিবেশে কষ্টকর ও অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার নিদর্শন হলো এই এস.বি. সেল। দৈনিক সেখানকার অফিসারদের জিজ্ঞাসাবাদের চেহারাও ছিল ভীষণ সাংঘাতিক। ওঁর ওপর থার্ড ডিগ্রীর প্রয়োগ না হলেও শেষ দিনে সত্যেন গাঙ্গুলী নামে এক অফিসারের হাতে ঘুষি খেতে হয়েছিল, লোভের কাছে নতিস্বীকার না করার জন্য। এই জেলের ভিতরে থাকাকালীন সমরেশের ভাবনা চিন্তায় পরিবর্তন আসতে শুরু করলো। তিনি জেলে থাকাকালীন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখে গেছেন—

> ''জেল বাস আমাকে জীবনের নতুন দিগন্ত দেখিয়েছে। ক্ষতির সম্ভবনা ছিল। কিন্তু ক্ষতি করতে পারেনি। অসংখ্য ভালো কমরেড ছিলেন। যাঁদের মধ্যে মানবিকতা বোধ ছিল গভীর। সেই সময় থেকেই আমি অনুভব করতে আরম্ভ করি, বিয়াল্লিশ সাল থেকে যেভাবে রাজনীতি করে আসছি, আমার সেটা পথ নয়। একজন রাজনৈতিক কর্মী হওয়ার থেকেও, একজন লেখক হওয়াই আমার ভবিষ্যৎ। এবং তা একটি পার্টির সীমাবদ্ধ নীতির দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না। সমস্ত তত্ত্ব বাদ দিয়ে একান্তভাবে মানুষের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে, দেশ ও কালকে সম্যক জেনে, মানবিকতাই হবে মূল তত্ত্ব। তথাপি আমি অস্বীকার করতে পারিনে, এসব সিদ্ধান্ত নিতে, পার্টির অতীতের অভিজ্ঞতাই কাজ করেছে। পার্টির কাছে আমার কৃতজ্ঞ না থাকার কোনো কারণ নেই। কিন্তু এটাও ঠিক, পার্টির কোনোরকম সমালোচনা মানে, মার্কসবাদের সমালোচনা নয়।''[২০]

জেলে থাকতেই সমরেশ চাকরি থেকে বরখাস্ত হলেন, মাসিক সাড়ে তিনশো টাকার সংস্থান তাঁর বন্ধ হয়ে গেল। অতএব তাঁর অনুপস্থিতে সংসারের পরিস্থিতি অত্যন্ত বেহাল হয়ে উঠলো এবং জেলের মধ্যে চলতে থাকলো পার্টির লোকের দুর্ব্যবহার, পুলিশের হুমকি। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে গৌরী তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে অর্থ সাহায্য চেয়ে আবেদন করেন। প্রায় দেড়শোর মতন সরকারী মাসোহারার টাকা দিয়ে চার ছেলেমেয়ে

নিয়ে বস্তির একটা মাটির ঘরে কোনোরকমে দিন গুজরান হতে থাকলো। এই কারাবাসের সময়ই সমস্ত দুঃখ অশান্তি নির্যাতন ও উদ্বেগের মধ্যেও সমরেশের শিল্পীমন সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। তিনি তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'উত্তরঙ্গ' (১৯৫১) রচনার জন্য সেই সময় থেকেই বদ্ধপরিকর হন। তাঁর ভাষায়—

> ''চাকরির কাল উনিশশো তেতাল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশের ডিসেম্বর। এই সময়টাতে ছুটির অবকাশে অথবা কাজের শেষে রাত্রে, চটকলগুলোর গঙ্গার ধারে ধারে ঘুরে বেড়িয়েছি, বস্তিতে বস্তিতে গিয়েছি ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলন এবং পার্টির কাজে। তারই সঙ্গে, নানান জনের সঙ্গে নানান গল্প, চটকলের বিষয়ে। বিশেষ করে নবকুমার দাশ, যাঁকে 'উত্তরঙ্গ' উৎসর্গ করেছি। তাঁর বয়স তখন নব্বুইয়ের উর্দ্ধে।... অষ্টাদশ শতাব্দীর ষাট দশক থেকে তিনি একটার পর একটা চটকল তৈরি হতে দেখেছেন, ... তাঁর মুখ থেকে যখন গত শতাব্দীর চটকলগুলোর তার সাহেবদের মেমসাহেবদের, দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী সর্দারদের কাহিনী শুনতাম, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতো শরীর ও মন। 'উত্তরঙ্গ'র ভূমিকা তখন থেকেই আমার অবচেতনে কাজ করতে থাকে।''[২১]

জেলে থাকাকালীন তিনি 'লেবার অফিসার' নামে একটি নাটকও রচনা করেন। যদিও নাটকটি পরবর্তীকালে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। ১৯৬২ সালে নৈহাটি থেকে সমরেশরা 'উত্তরঙ্গ' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা বের করতেন। সেই কাগজে তিনি তাঁর বন্দি জীবনের ওপর একটা ছোটগল্প লেখেন, ''স্বীকারোক্তি'' নামে। কিন্তু এই গল্পকে কেন্দ্র করে তাঁকে পার্টির শত্রু আখ্যা দেওয়া হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে ওই গল্পে তিনি পার্টির গোপন তথ্য ফাঁস করেছেন। ১৯৫০ -এর শেষে বা ১৯৫১-র শুরুতে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যখন সমরেশ বাইরে এলেন তখন আর চাকরিতে ফিরে যাওয়া হয়নি। রাজনীতি আর করবেন না তাঁকে এই মর্মে অফিসে বণ্ড দিতে বলা হয়। তিনি রাজি না হওয়ায় ওখানেই চাকরি জীবনের ইতি ঘটে যায়। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় যে মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, জেল থেকে বের হওয়ার পরে তাও বন্ধ হয়ে যায়। দিন কাটতে লাগলো নিঃস্ব, নিরন্ন অবস্থায়। চোখের সামনে অভুক্ত স্ত্রী ও সন্তানরা এবং দশ টাকা ভাড়া বাবদ একটি টালির ঘর। আর ছিল ঘরের মালিকের তীক্ষ্ণ বাক্যবাণের ভয়।

দেশবিভাগ ও ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক সংঘাতের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন হল, ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট। অখণ্ড বাংলাদেশ বিভক্ত হলো। স্বাধীনতার পূর্বে দেশবাসী জীবনপণ লড়াই করেছে দেশকে বিদেশীদের শাসন থেকে মুক্ত করার আশায়। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে আর সেই উদ্যম থাকলো না, কারণ দেশ তখন স্বাধীন। অথচ দিনে দিনে মানুষের সমস্যা বেড়েই গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সর্বোপরি স্বাধীনতা পরবর্তী দেশবিভাগ ইত্যাদির কারণে দেশের আর্থিক কাঠামো ভেঙে পড়ে। শুরু হয় আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে বিশৃঙ্খলা। বলা যায় স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গের যাত্রা শুরু হয় এই রকম বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক কাঠামো নিয়ে। দেশ বিভাগের ফলে বাস্তুহারা মানুষেরা দলে দলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে এদেশে আসতে লাগলো। উদ্বাস্তু সমস্যা একটি জাতীয় বিপর্যয়ের চেহারা নিয়ে দেখা দিল। খাদ্য সংকটের প্রকোপে, বেকারত্বের জ্বালায় এবং উদ্বাস্তু হয়ে এসে বসবাসের সংকটের দরুণ শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ আছড়ে পড়ে। কংগ্রেসে আস্থা হারিয়ে তারা বামপন্থার দিকে ঝোঁকে। কিন্তু ১৯৪৮ থেকে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সংকট ঘনিয়ে আসে। কমিউনিস্ট পার্টি ভারতীয় স্বাধীনতাকে 'ঝুটো' আখ্যা দেয় এবং সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক দেয়। কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিকে ১৯৪৯-এ বেআইনী ঘোষণা করে। নেতারা সবাই আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে যান। সশস্ত্র বিপ্লবের পথ ধরেই এসেছিল ১৯৪৯ -এর ৯ই মার্চ তারিখটি। যা পরবর্তীকালে সমরেশের অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসে—

> ''ঊনিশ শো ঊনপঞ্চাশের ৯ মার্চ-এর ঐতিহাসিক ব্যর্থতার এখন আর আলোচনা নিষ্প্রোয়জন। অন্ধকারে, চটকল বন্ধ করতে গিয়ে, আমরা যত্রতত্র বোমা, অ্যাসিড বাল্ব সহ পেট্রোল বোতল ছুঁড়ে কেবল শ্রমিকদেরই সন্ত্রস্ত করেছিলুম। আর তারা লালঝাণ্ডার বাবা মা তুলে গালাগালি দিয়েছিল।''[২২]

১৯৫৩ সালে স্ট্যালিনের মৃত্যু ঘটে। ১৯৫৩ সালে ১৪ সেপ্টেম্বর নিকিতা ক্রুশ্চেভ কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯৫৮ সালে তিনি মন্ত্রিসভার প্রধানের দায়িত্ব নেন। তাঁর ক্ষমতা লাভের ফলে সোভিয়েত রাশিয়ায় স্টালিন নীতির অবসান ঘটে। এদেশে বামপন্থী আন্দোলন কিছুটা হতোদ্যম হয়ে পড়ে। ১৯৫৫ সালে নিষ্ক্রিয়তার কারণে তাঁর পার্টির সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায়। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর সমরেশ আর কমিউনিস্ট পার্টির

সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ করেননি।

জেলে থাকার সময় সমরেশের সঙ্গে সারা ভারত গণনাট্য সঙ্ঘের সেক্রেটারী নিরঞ্জন সেনের পরিচয় হয়। তাঁর ভাই হলেন শচী সেন, হেস্টিংস স্ট্রীটে বুক ওর্য়াল্ডের প্রকাশক। নিরঞ্জন সেন বলেছিলেন সমরেশ যদি কোনো বই প্রকাশ করতে চান, তাহলে অবশ্যই যেন তাঁর ভাইয়ের শরণাপন্ন হন। জেল থেকে বেরিয়ে সমরেশ একমাত্র লেখাকেই আশ্রয় করতে চাইলেন। আঁকড়ে ধরতে চাইলেন 'বি.টি. রোডের ধারে' (১৯৫২)-র সেই সমস্ত অন্ত্যজ মানুষকে। তাদের যন্ত্রণা, দুর্মর প্রেম, দুঃসাহসিকতা, শ্রমিক জীবনের দুঃখ, লাঞ্ছনা, আশাবাদকে নিয়ে সাহিত্যের পথে সমরেশ পা বাড়ান। প্রথম জীবনে রাজনৈতিক চিন্তা থেকে সমরেশ বুঝেছিলেন একক মানুষের ইচ্ছা বা সংগ্রাম কখনই মুক্তি আনতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন হয় মতবাদের, সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক দলের। মার্কসবাদীরাই প্রথম পৃথিবীতে শোষণহীন সমাজের প্রবর্তন করে। কিন্তু ধীরে ধীরে রাজনৈতিক দলের উপর তাঁর বিশ্বাস চলে যায়।

পঞ্চাশ দশকের একেবারে গোড়ার দিকে, হয়তো একান্নর শেষ বাহান্নর শুরু এই সময়ে বুক ওয়ার্ল্ডের প্রকাশক শচী সেনের সঙ্গে 'নয়পুরের মাটি' উপন্যাস নিয়ে সমরেশ দেখা করেন। কিন্তু প্রকাশকের সেটা পছন্দ হয়নি। তখন সমরেশ তাঁকে 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসের বিষয়বস্তু এবং রচনা পরিকল্পনার কথা বলেন। এবার শচী সেন উৎসাহিত হয়ে চুক্তি করলেন, এই বই লেখার জন্য তিনি সমরেশকে প্রতিমাসে পঞ্চাশ টাকা দেবেন। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক কখনোই এক সঙ্গে পঞ্চাশ টাকা তিনি হাতে পাননি। এদিকে সংসার চলা অত্যন্ত দায় হয়ে পড়ে। 'উত্তরঙ্গ' শেষ পর্যন্ত ছাপা হল, কিন্তু বই তখনো দপ্তরীর ঘরে। এক ঝড় জলের রাতে নিরুপায় হয়ে দপ্তরীর ঘর থেকে বই সংগ্রহ করে এনে সমরেশ নৈহাটির 'বাসন্তী কেবিনে (পরবর্তীকালে এই রেঁস্তোরাকে কেন্দ্র করেই 'শ্রীমতী কাফে' রচিত) বন্ধুদের কাছে বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করেন। তখনকার মতো সংসার নির্বাহে কিছুটা সুরাহা হয়। এই প্রথম বইটির মলাটের ওপর সমরেশের আজীবন একটা মমতা ছিল। 'নিজেকে জানার জন্যে' প্রবন্ধে সমরেশ সেই সুখকর স্মৃতির উল্লেখ করে বলেন—

> ''নৈহাটি বাসন্তী কেবিনে গিয়ে দেখলাম, বন্ধুবর সরোজ ছাড়া আর সবাই আছে।... নতুন বইয়ের গন্ধ, বন্ধুদের উষ্ণ অভ্যর্থনা গরম চা এক কাপ, এক কথায় মৃত সঞ্জীবনী সুধা। যতোদূর মনে পড়ে তিরিশ টাকারও কিছু বেশি

নিয়ে, আমার আতপুরের কুটিরে ফিরে গিয়েছিলাম। বইটার দাম ছিল সাড়ে তিন টাকা। ... সেই রাত্রিটি বড় সুখের। হাসিতে, চোখের জলে এক অনির্বচনীয় আনন্দে প্রাণটি ভরা, আমার লেখা প্রথম ছাপা বই আমার বুকে। কী তৃপ্তিদায়ক তার উষ্ণতা। ... কিন্তু তারপর? সাহিত্যের যা কিছু দায়, সে তো জীবনেরই কাছে। সাহিত্যের থেকে জীবন বড়, এ সত্যের জন্য, সাহিত্যিককে গভীর অনুশীলন করতে হয় না, তা সততই অতি জীবন্ত।"[২৩]

দৈনন্দিন জীবনে ক্ষুধা ও অপমানের মধ্যেও সমরেশ একটি কথা স্মরণ করেছিলেন, সেটি হল—

''আমার কমিউনিস্ট মতবাদের মধ্যে কখনো স্বাদেশিকতা বোধ ছিল না। 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসেই প্রথম জন্ম নিয়েছিল আমার স্বাদেশিকতা বোধ। তখন প্রথম চিঠি দিয়ে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন কবি বিষ্ণু দে। তাঁর দুটি কথা আমি এখনো মনে রেখেছি। প্রথমতঃ 'আপনার উপন্যাসটি পড়ে মনে হলো, রবীন্দ্র সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে আপনার পরিচয় অতি ক্ষীণ।' দ্বিতীয়তঃ 'আরো লিখুন গঙ্গার ধারের যে কথা আপনি লিখেছেন, আপনাকে দেখতে চাই তার সাগর সঙ্গমে।"[২৪]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠির মতোই এই চিঠি সমরেশকে সেই সময় গভীর প্রেরণা দান করেছিল। এই সময় তিনি কিছু ছোটগল্পের সঙ্গে হাত দিয়েছেন, 'সওদাগর' উপন্যাসে। গ্রীষ্ম বা শীতকে পরোয়া না করে টালির জীর্ণ ঘরে বসে, একটা জলচৌকির ওপর কাগজ রেখে অনলসভাবে অক্লান্ত কর্মা লেখকের লেখা চলতে থাকে। ইতিমধ্যে 'উত্তরঙ্গ'-র সমালোচনা 'পরিচয়' পত্রিকায় বের হল। চিন্মোহন সেহানবীশ উপন্যাসটির ওপর আনলেন অশ্লীলতার অভিযোগ। প্রথম উপন্যাস থেকেই সমরেশের প্রতি অশ্লীলতার অভিযোগ উচ্চারিত হয়। এর পরবর্তীকালে ১৯৬৭ সালে 'দেশ' পত্রিকায় শারদীয় সংখ্যায় 'প্রজাপতি' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়ে লেখক আবার অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হন। কোর্টের নির্দেশে 'প্রজাপতি' বাজেয়াপ্ত করা হয়। আঠারো বছর মামলা চলার পর শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে 'প্রজাপতি' অশ্লীলতা অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়। যাইহোক এর প্রতিবাদও হয়েছিল। অধ্যাপক বন্ধু সনৎ বসু 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় চিন্মোহন সেহানবীশের সমালোচনার প্রতিবাদ করলেন।

আবার ‘নতুন সাহিত্য’-র পরের সংখ্যায় অচ্যুৎ গোস্বামী সমালোচনা লিখলেন। তার প্রতি সমালোচনা লিখলেন গান্ধী ও বার্নাডশ-এর জীবনীকার ঋষি দাশ। ঋষি দাশ স্নেহের সঙ্গেই সমরেশকে গ্রহণ করেন। তিনি সমরেশকে ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানীর প্রহ্লাদ প্রামাণিকের সঙ্গে পরচিয় করিয়ে দেন। ১৯৫৩ সালে তিনি একটি গল্প সংকলন ‘মরসুমের একদিন’ প্রকাশ করেছিলেন। অন্যদিকে ‘সিগনেট প্রেস’ -এর দিলীপ গুপ্ত ‘উত্তরঙ্গ’ উপন্যাসের লেখককে একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানের আয়োজন করে পুরস্কৃত করলেন একটি ফাউন্টেন পেন (যা ছিল সমরেশের দীর্ঘদিনের প্রার্থিত বস্তু) এবং ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ‘সংবাদপত্রে সে-কালের কথা’র দুটি খণ্ড। জীবনে সেই প্রথম পুরস্কার, কী গভীর তার উত্তেজনা! কিন্তু কতোক্ষণ? আর্থিক সংকট তাঁর পিছু ছাড়ে না। এই সময় ‘উত্তরঙ্গ’- ন’মাসে প্রথম সংস্করণ বিক্রী হয়ে গেছে। ঋষি দাস দ্বিতীয় সংস্করণ দিলেন ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানীকে। শর্ত পনের পার্সেন্ট, রয়্যালটির পুরো একটি সংস্করণের টাকা এবং কিছু অগ্রিম আর একটি গল্পের বই ‘অকাল বৃষ্টি’র জন্য। শ্রদ্ধেয় ঋষিবাবুর কথা প্রকাশক সেদিন অমান্য করতে পারেন নি। এই সময়ে ‘চতুষ্কোণ’ পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় এবং প্রথম সংখ্যায় প্রদ্যোৎ গুহ একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লিখবার জন্য বলেন। অতঃপর তাঁর অনুরোধে এই পত্রিকায় শারদীয় সংখ্যায় লিখেছেন ‘শ্রীমতী কাফে’ (১৯৫৩)। এই প্রথম তিনি একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস—পুস্তকাকারে যা অনেকটা বড়—লিখে কোনো পত্রিকার কাছ থেকে এককালীন একশো টাকা পেলেন। যদিও ইতিপূর্বে ‘নতুন সাহিত্য’ পত্রিকায় তাঁর ‘বি.টি. রোডের ধারে’ (১৯৫২) -এ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। আর ‘নয়নপুরের মাটি’ (১৯৫১)—যা কিনা ‘আদাব’ (১৯৪৬) গল্পেরও আগে লিখিত,—গ্রন্থটি আলোচনা করতে গিয়ে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—

> ‘‘তাঁর এই প্রথম পরিকল্পনাতে যেন তাঁর দীর্ঘ পথ পরিক্রমার প্রান্তে অপেক্ষমান শেষ লেখার পহেলা প্রস্তুতি। শেষ ‘অসমাপ্ত’ লেখাটির বিষয় ছিল এক শিল্পীর শিল্পনিয়তি। প্রথম লেখাটিতেও তারই পূর্বাভাস।... সমরেশের জীবনের প্রথম পর্বে তাঁর অভিপ্রায় ছিল চিত্রশিল্পী হয়ে ওঠা। ... শিল্পীর যন্ত্রণায় তাঁর যে সহজাত দীক্ষা, তার প্রথম প্রকাশ ‘নয়নপুরের মাটি’-তে। অসম্পূর্ণতা কিছু আছে, আছে নির্মিতিগত শৈথিল্য কিন্তু সমরেশের সাহিত্য প্রতিশ্রুতি তাঁর এই প্রথম প্রয়াসে অবশ্য দীপ্যমান।’’[২৫]

বেঁচে থাকার সংগ্রামের সঙ্গে শুরু হয়েছিল লেখকের সাহিত্য জীবনের এবং সাহিত্যই ছিল তাঁর জীবিকা। তিনি তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে একের পর এক বিখ্যাত সব উপন্যাস রচনা করে যান। তবে সাহিত্যিককে বেঁচে থাকতে হয় কেবল জৈবিক ভাবে নয়, আরো বহুতর বাধার বিরুদ্ধে। ব্যক্তিগত ঈর্ষা থেকে রাজনীতি, এমনকি আত্মার আত্মজনেরাও বাধার ব্যূহ রচনা করে। ক্রমে জটিলতা বাড়ে, সৃষ্টি নতুন দিগন্তের সন্ধান করে, আর প্রতিষ্ঠা সংগ্রামকে তীব্রতর করে, কেবলমাত্র বাইরে নয়, ঘরেও।

'বি.টি. রোডের ধারে' লেখার পরে তাঁর মনে একটি গভীর জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয়—

> ''মানুষ কি নিরন্তর তার জীবনকে (বেঁচে থাকাকে) এক সুদূর অনিশ্চয়তার মধ্যে শিকার করে ফিরছে? এই জিজ্ঞাসা জেগেছিল, গঙ্গার বুকে মৎস্যজীবীদের সঙ্গে মাছ মারতে গিয়ে। মাছ 'ধরা' কথাটা তখনই অসত্য মনে হয়েছিল এবং মৎসজীবীদের আমি অভিহিত করেছিলাম 'মাছমারা' নামে। নির্দয় অসহায় সেই শিকারী জীবন, যার সার্থকতা কেউ বা কোনো নীতি তাদের হাতে তুলে দিতে পারে না, তাদের ঐকান্তিক বিশ্বাস আর নিরন্তর চেষ্টা ব্যতিরেকে। সম্ভবত সেই সময়ের কয়েকটি গল্পও আমাকে এই জিজ্ঞাসায় উন্মুখ করেছিল। যেমন 'পাড়ি' বা 'দুই বন্ধু' ইত্যাদি ... প্রকৃতই মানুষ জীবনকে সুদূর অনিশ্চয়তার মধ্যে শিকার করে ফিরছে। ক্ষেত্র বিশেষে, চেহারা তার যতো প্রিমিটিভই হোক, মানব সমাজের উত্থানের শক্তি হয়তো সেখান থেকেই।''[২৬]

'গঙ্গা' উপন্যাস এই শিকারের কাহিনি। এই উপন্যাসটির জন্যই সমরেশ আনন্দ পুরস্কার (১৯৫৮) পান।

সাধারণভাবে সাহিত্যের পরিবর্তন সমাজের কোনো বিশেষ পরিবর্তনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। সাহিত্যের সৃষ্টি হয় সমাজে এবং স্রষ্টাও হলেন সমাজস্থিত একজন মানুষ। অতএব সাহিত্যের ওপর সমসাময়িক জীবনচর্যার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। উপন্যাসের ক্ষেত্রে যা স্বীকার্য। উপন্যাস মূলত সমাজের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে আবদ্ধ ব্যক্তিজীবনের চিত্র। সেখানে ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজজীবন মিলিয়ে সামাজিক মানুষের পূর্ণাঙ্গ চিত্র উপস্থাপিত হয়। সঙ্গে মিলিত হয় স্রষ্টার জীবনদৃষ্টি। সমরেশ বসুর উপন্যাসগুলিতেও ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে সামাজিক

সম্পর্ক, সমাজ-পরিবেশ তথা সমাজ কাঠামোর প্রকারভেদ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে থাকে। এগুলি ছাড়াও সমরেশ বসুর লেখাগুলিতে একটি বিশেষ দিক খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর অধ্যাপক বন্ধু সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই দিককে উন্মোচিত করে বলেছেন—

> ''সামাজিক মানুষ, আত্মসমীক্ষক মানুষ, নিজের কাছে নিজেরই হিসাব নিকাশের জন্য উদ্বিগ্ন মানুষ — অর্থাৎ 'উত্তরঙ্গ' পর্বেই হোক, আর 'বিবর' পর্বেই হোক, অথবা 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' পর্বে, অথবা একেবারে শেষতম সুমহৎ সৃষ্টি 'দেখি নাই ফিরে' তেই হোক, ব্যক্তির স্বাধীনতার প্রশ্নটা তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর নায়কদের বন্ধন ও মুক্তির দ্বৈতাদ্বৈতে বারে বারে তাঁর নিজের আত্মোন্মোচন। যে নৈরাত্ম্য-সামর্থ্যে এ জাতীয় উপন্যাসে শিল্পসিদ্ধি, বিষয় ও ব্যক্তি পাত্র নির্বাচনে বার বার সমরেশ সে বিষয়ে তাঁর লক্ষ্যবেধ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।''[২৭]

সম্ভবত ষাট দশকের প্রারম্ভে বা তারও কিছু আগে কবি সাহিত্যিকরা আমন্ত্রিত হন শান্তিনিকেতনে। তিন দিনের সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হন সমরেশও। সেখানে অন্নদাশংকর রায়ের স্ত্রী লীলা রায় কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি কেন লেখ?'। জিজ্ঞাসার সঙ্গে তাঁর চোখে ও ঠোঁটে ছিল স্নিগ্ধ হাসির কিরণ। লেখক কিছুটা ভেবে উত্তর দেন— 'জানবার জন্যই লিখি।' 'কী জানবার জন্য?' তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন। সমরেশ জবাব দিয়েছিলেন 'মানুষকে জানবার জন্য।' আর তাঁর এই জবাবই শ্রীযুক্তা রায়ের পরবর্তী প্রশ্নকে যথার্থ সংকেতময় করে তুলেছিল— 'নিজেকে জানবার জন্য নয় কেন?' সমরেশের মনে হয়েছিল বিশ্বে এই জিজ্ঞাসা যেন প্রথম উচ্চারিত হয় তাঁর জীবনে। সেই মুহূর্তের জিজ্ঞাসা যেন তাঁর লেখক সত্তার ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব ক্রিয়া করেছিল। অনেকটা রবীন্দ্রনাথের সেই 'নিশীথে' গল্পের অলৌকিক আর্ত জিজ্ঞাসা, 'ও কে, ও কে, ও কে গো?' -এর মতো মস্তিষ্ক জুড়ে শুধু প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। তিনি আরো বলেছিলেন— 'নিজেকে জানবার জন্যও তো লেখা উচিত। নিজেকে জানলে, তোমার সত্যকেও হয়তো তুমি জানতে পারবে।' যেটা একজন সাহিত্যিকের পক্ষে একান্ত জরুরি।'[২৮]

'বি.টি. রোডের ধারে' (১৯৫২) প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই সমরেশ সম্পর্কে অনেকেরই কৌতূহল প্রকাশ পেতে থাকে। 'উত্তরঙ্গ'-কে কেন্দ্র করে প্রথম থেকেই সমরেশ

তুমুল বিতর্কের সম্মুখীন হন। 'মরশুমের একদিন' গল্পটিতে দেহোপজীবিনীদের প্রসঙ্গ নিয়ে। (প্রধান চরিত্রটি বেশ্যালয়ে যেত তবলা বাজাতে) আপত্তি ওঠে। তখন সমরেশ যা লিখতেন তার প্রতি তির্যক দৃষ্টিতে তাকানো যেন প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সমরেশের শিল্পী সত্তা সমস্ত রকমের বাধা বিপত্তি ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। রাজনৈতিক টানা পোড়েন, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও পরিবারিক অবস্থান থেকে তিনি ক্রমশ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছিলেন। কিছু ছোটগল্প ছাড়াও তাঁর 'বি.টি. রোডের ধারে', 'শ্রীমতী কাফে'-র প্রকাশ ঘটে গেছে বিভিন্ন সাহিত্য পত্রে। একদিকে তখন তিনি লেখক হিসেবে কিছু স্বীকৃতি পেয়েছেন এবং অন্যদিকে চার সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে সংসারে প্রবল আর্থিক অনিশ্চয়তা চলছে। এই দো-টানায় যখন সংসার চলছিল, তখন তাঁর সঙ্গে সরোজ আচার্যের পরিচয় ঘটে। এর পর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র সম্পাদক সরোজ আচার্যের পরামর্শে এবং সাগরময় ঘোষের আমন্ত্রণে সমরেশ 'দেশ' পত্রিকায় 'গুণিন' গল্পটি ছাপতে দেন। কিন্তু এই লেখাটি নিয়ে পার্টির বন্ধুদের সঙ্গে সমরেশের প্রচণ্ড বিরোধ দেখা দিল। বিষয়বস্তু নিয়ে আপত্তি ছিল না কিন্তু ওঁদের মূলত আপত্তি ছিল বামপন্থী লেখক হিসেবে সমরেশ কেন 'আনন্দবাজার' মালিক গোষ্ঠীর ছত্রছায়ায় যাবেন। ইতিমধ্যে আবার গল্প চেয়ে পাঠান সাগরময় ঘোষ। এই সময় ওঁর পক্ষে পার্টি করা ক্রমশ অসম্ভব হয়ে পড়ছিল, কেননা পার্টি মানে তো শুধুমাত্র একটা আদর্শগত সংগ্রামকে বাঁচিয়ে রাখা নয়, পার্টির ভেতরেও যে একটা সংঘাত থাকে। শেষ পর্যন্ত সমরেশ দৃঢ় সংকল্প হন, চাকরি করবেন না, লেখাই হবে তাঁর জীবিকা। ওই সময় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় সমরেশ কয়েকটি পৌর এলাকার পর্যালোচনামূলক ফিচার লিখেছিলেন। এই ব্যাপরে তাঁর সহায়ক ছিলেন তরুণতর লেখক বন্ধু সোমনাথ ভট্টাচার্য। এই ফীচারগুলির জন্য কাজ করতে গিয়ে সমরেশের দৃষ্টিতে 'মাটি ও মানুষের' বাস্তব স্পন্দন ধরা পড়লো। ওই সমস্ত ফিচারগুলির মধ্যে সমরেশের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

সুরথনাথ নামটি পরিবর্তিত হয়ে 'সমরেশ' হয়েছিল বন্ধু ও শ্যালক দেবশংকরের ইচ্ছায়। সেই নামেই তিনি সারা দেশে পরিচিত। এই নামটি ছিল বন্ধু প্রদত্ত একটি সুনির্বাচিত নাম, তেমনি 'কালকূট' ছদ্মনামটি হলো তাঁর স্বনির্বাচিত। লেখকের ভাষায়— ''একজন লেখক যখন ছদ্মনামের আশ্রয় নেয়, তখন সে কোনো কথা কাউকে জানাতে চায় না বলেই বোধ হয় নেয়। শখ করে কেউ ছদ্মনাম নেয় কী না জানি না।''[২৯] এই আলোচনা প্রেক্ষিতেই প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে

পারে এই লেখকের নিজ নাম নির্বাচনের তাৎপর্য। তাঁর মূলত এই দুটি সত্তার মধ্যে কখনও তিনি সংগ্রামী সমরেশ, কখনও বা তিনি কালজয়ী কালকূট। কখনও তিনি বাস্তবের জটিলতা, রাজনৈতিক উত্তালতায় ভেসে যান আবার কখনও বা তিনি হলেন অচিন পাখির গান শুনে জীবন পুরের পথিক। তাঁর হাতে বোমা থাক বা কাঁধে ঝোলা তিনি হলেন বরাবরই বিবাগী, ঘর ছাড়া বাউল মনের মানুষ। তাই নিদারুণ দারিদ্র্যের ও আর্থিক অস্বচ্ছলতায় সমরেশ সংসারের প্রতি দায় দায়িত্ব পালন করেও, জীবনের রহস্য সন্ধানে বার বার সাংসারিক বৃত্তের বাইরে চলে যান।

১৯৫২ খ্রীঃ সমরেশ রাজনীতি, লেখা, সংসার এই এ্যহস্পর্শে জেরবার হয়ে উঠেছিলেন। এই বছরে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। পিতা মোহিনীমোহন প্রয়াণের পূর্বে শুধুমাত্র সমরেশের 'উত্তরঙ্গ' বইটি প্রকাশিত হতে দেখে যান। ইতিমধ্যে একটি রাজনৈতিক দলের উস্কানিতে উত্তর-চব্বিশ পরগণার শিল্পাঞ্চলে বাঙালি-বিহারী দাঙ্গা লেগে যায়। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এবং আংশিক ভুক্তভোগীও ছিলেন লেখক। সেই ঘটনাই তখন লিখেছিলেন, ছদ্মনামের আড়াল নিয়ে। কারণ তখন নিজের নামে লেখাটি প্রকাশ করবার ঝুঁকি ছিল। লেখাটি 'ভোটদর্পণ' নামে ছাপা হয়েছিল একটি কমিউনিস্ট মতবাদী পত্রিকায়। সেই প্রথম রাজনৈতিক রচনায় কালকূটের আত্মপ্রকাশ। তারপর এই নামে রাজনীতি নিয়ে কিছু লেখেন নি। কালকূট নামে তাৎপর্যও তখন তাঁর কাছে পরিস্ফুট হয়নি। তখনো পর্যন্ত সমরেশের অভিজ্ঞতার জগৎ ছিল সংকীর্ণ। সিগনেট প্রেসের ডি. কে গুপ্ত তাঁর 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসকে বলেছিলেন 'খাঁটি দিশি লেখা'[৩০] কিন্তু সেরকম দেশি লেখার জন্য আরো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা চাই সমরেশ নিজে লিখেছেন—

> ''এই শুরু থেকে আমি নিরন্তর লিখে চলেছিলাম গল্প উপন্যাস। এ পর্যায়ে যে সব লেখা হচ্ছিল, তার মধ্যে আমি অনুভব করছিলাম, আমার লেখার জগত, ভাবনা ও বিচরণক্ষেত্র খুবই সীমিত। সমগ্র ভারতবর্ষকে দেখবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়েছিলাম। কিন্তু আমার মতো একজন দরিদ্র সাহিত্যিকের পক্ষে সারা ভারতের গ্রাম জনপদ ঘুরে দেখা সম্ভব ছিল না।''[৩১]

উপন্যাস লেখকের লেখার জন্য চাই বিস্তৃত অভিজ্ঞতা, স্বাধীনতা উত্তরকালে উপন্যাসিকেরা কল্পিত জগৎ থেকে সরে এসে প্রতিদিনের জীবন বাস্তবতার ছবি আঁকতে চাইছিলেন। তাঁদের

কাছে মানুষকে শুদ্ধ আদর্শবাদের দিক থেকে বড় করে দেখার চেয়ে বাস্তব করে দেখার তাগিদ ছিল। এজন্য তাঁদের লেখার মধ্যে ফুটে উঠছিল মানুষের অন্ধকারময় জীবনের কথা।

যে মানুষ নিজের ভিতরে জমে ওঠা বিধেয় যন্ত্রণায় কাতর। যে মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থপর এবং অহংপূর্ণ, যে মানুষ পাপী অথচ অসহায়, সেই সব মানুষের আত্মিক এবং সমরেশ তাঁর বি.টি. রোডের ধারে 'গঙ্গা'—এসব লেখায় এই বাস্তব প্রেক্ষিত মানুষের বাঁচবার অসহায় চেষ্টা, সফলতা বা ব্যর্থতার ছবি এঁকেছেন। কিন্তু আরো ভালো করে মানুষকে জানার জন্য, তার মনের গহণ জগৎকে বোঝার জন্য দরকার আরো জানার দেখার।

১৯৫৪-র জানুয়ারি, এইসময় চারিদিকে শুরু হয়ে গেছে প্রয়াগের কুম্ভমেলায় যাওয়ার তোড়জোড়। এর ঢেউ এসে লাগে সমরেশের বদ্ধ প্রাণে। সৃষ্টি হয় বন্ধন মুক্তির আলোড়ন। অনুভব করেন একঘেয়ে দিনযাপনে, প্রাণধারণের গ্লানিতে তিনি ও তাঁর শিল্পী মন কোথায় যেন আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। মনের প্রবল ইচ্ছে এলাহাবাদের ত্রিবেণী সঙ্গমে পূর্ণ কুম্ভ যোগ দেন তিনি। সেখানে যে সারা ভারতের লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মিলন ঘটবে। লেখকের মনের আবেগে ও নবতর এক উপলব্ধির ভিতরে এক অন্যতর সৃষ্টির উন্মাদনা উন্মুখ হয়ে ওঠে। কেমন এক আনচান করা ভাব, চোখের সামনে কল্পনায় আঁকা হয়ে গেছে প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে মহামানবের মেলার ছবি। বাঁশির ডাক শুনতে তাঁর ভুল হলো না। সমস্ত দেশের মূর্তির দর্শন পেতে হলে, চলো সেই মেলা প্রাঙ্গণে। তাঁর প্রাণের ব্যাকুলতা ঠিক এইরকম— 'কেবল মনে হতে লাগলো, বড় অন্ধকারে আছি। চোখ ভরে দেখা হয়নি আপন রূপেরই বিস্তৃতিকে।'[৩২] কিন্তু কেমন করে? ঘোরা ফেরাতে খরচ যে বিস্তর। এদিকে পকেট শূন্য, ঘরে অন্ন বাড়ন্ত। তাঁর ভাষায়—

> ''কিন্তু সন্ন্যেসী বিবাগী তো নই। ঝোলাঝুলি কাঁধে নিয়ে, জয় গুরু বলে বেরিয়ে পড়ার উপায় নেই। আমি তীর্থযাত্রীও না। ভিন্ চালের টান আমার, সঙ্গম টেনেছে আমাকে, আমার দেশের নানা রূপের এক মূর্তি ধরে। মূর্তির হাতছানি দিয়ে। আমার নিজের পরিচয় যে সেখানে রয়েছে।''[৩৩]

কিন্তু উপায় কি? কড়ি চাই, পারানির কড়ি। অগতির গতি ভেবে তিনি অগ্রজ সাহিত্যিক মনোজ বসুর কাছে তাঁর মনের কথা পাড়লেন। যদি তিনি কিছু ব্যবস্থা করে দেন। সব শুনে মনোজ তাঁকে 'যুগান্তর' পত্রিকার পরিমল গোস্বামীর কাছে একটা চিঠি দিয়ে পাঠালেন। কিন্তু

সমরেশের কাছ থেকে চিঠিটা নিয়েও কেন যে হাতটা তুলে চলে যাওয়ার ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন কোনো আশা নেই। এই বিরূপ ব্যবহারের কারণ, সমরেশের কখনই বোধগম্য হয়নি। যদিও শারদীয় 'পরিচয়'-এ ওঁর গল্পের সঙ্গেই সমরেশের প্রথম প্রকাশিত লেখা 'আদাব' গল্পটি একত্রে ছাপা হয়েছিল। এমনকি ওঁর অনেক লেখার সঙ্গে সমরেশও পরিচিত ছিলেন। অথচ কেন এই প্রচণ্ড তাচ্ছিল্য তা সমরেশ জানতেন না। সুতরাং নিঃশব্দে ফিরে এলেন তিনি। দুঃখ, অপমানবোধ তখন তল-অতল, মনে একটাই ভাবনা কেমন করে সেই মহামানবের মেলায় পৌঁছানো যায়। ইতিমধ্যে 'দেশ' পত্রিকায় আরও দু-একটা গল্প তিনি লিখেছিলেন। মনে ভাবলেন সাগরময় ঘোষকে বললে কেমন হয়। যেমন ভাবনা তেমন কাজ, বর্মন স্ট্রিটের আনন্দ বাজার পত্রিকার অফিসে গিয়ে হাজির হলেন। সব শুনে অফিসের প্রভাবশালী ব্যক্তি কানাইলাল সরকার অনুমতি দিলেন। চুক্তি হল মেলায় প্রতি দিনের বিশেষ বিশেষ সব ঘটনা, রোজ একটা ইনল্যাণ্ড খামে লিখে কলকাতায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র অফিসে পাঠাবেন। সেগুলো 'দেশ'-এ নয়, ছাপা হবে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় এবং বক্স ক্যামেরায় যে ফটো তুলবেন তার নেগেটিভ দেখে শুনে প্রিন্ট করে নেওয়া হবে। প্রত্যেকটি চিঠির জন্য কুড়ি টাকা করে দেওয়া হবে। কিন্তু তাঁরা আগাম টাকা দিতে পারবেন না। তাঁরা এলাহাবাদের অরুণ মিত্রের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। যিনি কিনা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় উত্তর প্রদেশের চিঠি লেখেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসী ভাষার অধ্যাপক ড. অরুণকুমার মিত্রের সঙ্গে তাঁর পূর্বেই পরিচয় ছিল। টাকা-পয়সার আগাম ব্যবস্থা করতে না পারলেও সাগরময় আশ্বাস দিলেন যে, এলাহাবাদে অরুণ মিত্রকে পেয়ে গেলে তখন বোধহয় আর আটকাবে না। অতএব, মাভৈঃ ! চলো, চলো, প্রয়াগ চলো, সঙ্গমে ভারত-দর্শনে চলো।

সমরেশ প্রথমেই অরুণ মিত্রকে চিঠি লিখলেন। একটা বক্স ক্যামেরাও জোগাড় করে ফেললেন। মেজদা বীরবলের কাছ থেকে রেল কোম্পানীর একটা গরম ওভারকোটও নিয়ে এলেন। কারণ মাঘ মাসের শীত বলে কথা। অবশ্য ওভারকোটের ওজন ছিল সমরেশের চেয়েও বেশি। তবে উত্তর প্রদেশের শীতের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য তার জুড়ি নেই। শেষ পর্যন্ত সব ব্যবস্থা করে শুরু হল কুম্ভমেলার উদ্দেশে যাত্রা। যাত্রার শুরুতেই রেলের কামরায় এক জীবিত সহযাত্রীকে মৃত্যুবরণ করতে দেখলেন। তাঁর মতোই সেও ছিল একাকী যাত্রী। এলাহাবাদে পৌঁছেই দেখতে পেয়েছেন বিশাল যাত্রীর বহর, যারা সঙ্গমস্থলের দিকে

এগিয়ে চলেছে। মন পড়ে রয়েছে সেই খানেই। তাঁর অবস্থা দেখে অরুণ মিত্র বলেন—দেখে মনে হয়, প্রয়াগে মাথা না মুড়িয়ে যাবে না। একেবারে মার্কসবাদ থেকে অধ্যাত্ম বাদে উত্তরণ। অবশ্য কথাতেই বলে প্রয়াগে মাথা মুড়িয়ে পাপী যেখানে খুশি মরতে পারে। তার মানে সব পাপ ধুয়ে যায়। কিন্তু অধ্যাত্মবাদ? যার অনুভূতির ক্রিয়া তিনি কখনও বুঝতে পারেননি। তিনি তো দেখতে চেয়েছিলেন তাঁর দেশের সমগ্র রূপকে। সারা ভারতকে দেখতেই তো এই ছুটে আসা। তাঁর বয়ানে যা স্পষ্ট, যথা—

> ''সেখানে আমি দেখলাম সারা ভারতকে—সেই দেখা আমার কাছে এক বিরাট আবিষ্কার! ধর্মের উন্মাদনা নয়, সারা ভারতের মানুষ এসেছে যেখানে আলোকের সন্ধানে। তাদের অন্তরের সকল অন্ধ কারের গ্লানিকে মুক্তিস্নানে ধৌত করার গভীর আকাঙ্ক্ষায়। সেখানে আমি দেখলাম, উত্তর প্রদেশের পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ, হতদরিদ্র কৃষক। তার নব্বুই বছরের বৃদ্ধা মাকে কাঁধে বহন করে নিয়ে আসছে দূরের গ্রাম থেকে, পাঁয়ে হেঁটে। সে যৌবনে তার মাকে কথা দিয়েছিল, তোমাকে আমি প্রয়াগ দর্শনে নিয়ে যাবো। পঁচাত্তর বছর বয়সে সেই কথা রাখবার সময় এসেছিল তার জীবনে। এ দৃশ্য পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় কী না আমি জানি না। সেই কৃষকের রক্তাক্ত পায়ে চলা পথের ধূলা কুড়িয়ে নিয়ে আমি মাথায় স্পর্শ করেছিলাম। কুম্ভমেলা থেকে ফিরে, সেই প্রথম আমি 'কালকূট' ছদ্মনাম নিয়ে, 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' লিখেছিলাম।''[৩৪]

জীবন যে কখনও এক জায়গায় থেমে থাকে না, অতএব সাহিত্য চর্চাও এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারে না। স্বনামে ও ছদ্মনামে, 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' থেকে শুরু করে মৎস্যজীবীদের সঙ্গে জীবন কাটিয়ে 'গঙ্গা' উপন্যাস পর্যন্ত একটা পর্যায় ধরা যায়। সেই সময়ে সমরেশের মনে এক নতুন জিজ্ঞাসার জন্ম হয়। তিনি অনুভব করেন সাহিত্যচর্চা হল জীবনচর্চারই একটি ক্ষেত্র তাঁর ভাষায়—''কেবল অপরকে জানার জন্য নয়, নিজেকে জানবার জন্যই লেখার দরকার হয়ে পড়েছে।''[৩৫]

প্রয়াগের কুম্ভমেলার যে অভিজ্ঞতা ধারাবাহিক ভাবে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় প্রকাশ পেয়েছিল, সেই অভিজ্ঞতা এক অন্যতর রূপে প্রকাশ পেল উপন্যাসে। কালকূটের বিষবাহী

প্রাণের অমৃত সন্ধানের কথা এবারে 'দেশ' পত্রিকায় একটু বিষদভাবে প্রকাশিত হল। ছ'সপ্তাহ ধরে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র শেষ পাতায় ফটোসহ বিবরণ মুদ্রিত হয়েছিল। সঙ্গমে ভারতবর্ষের সমগ্র রূপ তাঁকে পাগল করেছিল। সেখানে 'বিশ্ব করে কোলাকুলি'। তিনি দেখেছেন নগ্নতার কী বিচিত্র মূর্তি! নগ্ন রূপেও কী গভীর উদাসীনতা। পাশ্চাত্যের নগ্নতা যেখানে মনের মধ্যে ধিক্কার সৃষ্টি করে সেখানে ভারতীয় নারীদের নগ্নতার মধ্যে তিনি দেখেছেন ভারত দর্শনের আর এক রূপ। প্রয়াগ দর্শন তাঁর জবাণীতে—

> ''চলল আমার ভারত দর্শন। রোজ চিঠি একটি লিখি, সংবাদ দিয়ে। কিন্তু কতটুকু আর লেখা যায়! সংবাদের থেকেও আমার প্রাণে বাজছে অন্য সুরে। কবির কবিতা আমার চোখে এই ভারত রূপ দেখেই ভোর, 'জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল/লাখো লাখো যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল।' পুরাণ আর ইতিহাসের স্মৃতি, আর সারা ভারতের মানুষ, তাদের ভাষা পোশাক খাদ্য আর নানান ধর্মীয় আচরণ, মনে হচ্ছে, আমি যুগ থেকে যুগান্তরে এক লীলাক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছি। এই রূপের মধ্যে আমার চোখে ভেসে উঠছে হাজার হাজার বছর আগের নানান ঘটনা। যেন এক আবছায়ায় আমি সব দেখতে পাচ্ছি।''[৩৬]

মেলার শেষ দিনটিতে তিনি দেখলেন মহাশ্মশানের ছবি। সঙ্গমে পুণ্যস্নানের লগ্নমুহূর্তে যাওয়া আসার পথের ভুলে, বিশৃঙ্খলায় শত শত মানুষ, নারী, পুরুষ বৃদ্ধ শিশু পিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেই শোকার্ত পরিবেশে, স্বজন হারাদের হাহাকারের মধ্যে বিশাল চিতার আগুন প্রয়াগের আকাশ স্পর্শ করেছিল। যে চিত্র অত্যন্ত মর্মন্তুদ। কালকূটের মনে হয়েছিল তিনি যেন অশৌচ নিয়ে ফিরে এলেন। যেন শ্রাদ্ধ, শান্তি, আত্মার পূজা না হলে কোন মুক্তি নেই। অতএব প্রাণের অশৌচ নিয়ে তিনি আবার চলে গেলেন সাগরময় ঘোষের কাছে। একটাই আবেদন 'দেশ' পত্রিকায় প্রয়াগের অভিজ্ঞতা বিস্তৃত করে লেখার অনুমতি দিতে হবে। ১৯৫৫ সাল, সেই সময় তিনি আতপুর থেকে নৈহাটিতে চলে এলেন। অন্যান্য কাগজেও কিছু গল্প লিখতেন। আবার 'পরিচয়' পত্রিকাতেও মাঝে মাঝে দু-একটা করে গল্প ছাপা হচ্ছিল। চার কিস্তিতে 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' নাম দিয়ে 'দেশ' -এ ছাপা হলো। এবং তা 'কালকূট' ছদ্মনামে ছাপা হল। এই নাম গ্রহণের কারণ স্বরূপ বলেন—

> ''...ছদ্মনাম নিলাম এই কারণে যে তখন আমি যে ধরণের লেখা লিখতাম, এই লেখাটা ('অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' ১৯৫৪) তার থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। আমি মেলায় যা দেখে এসেছি, ব্যাপারটাকে ওই ভাবেই রাখতে চাই, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব তথ্য তুলে ধরতে চাই। তাই আমি ভাবলাম যে, আমি ছদ্মনামের আড়ালে থাকব। এখানে আমি তো কল্পনার কোনো আশ্রয় নিচ্ছি না, সত্যি সত্যি যা দেখে এসেছি তাই লিখব। তাই সমরেশ বসু নাম না নিয়ে অন্য নাম নিলেই যেটা ঠিক হবে।''[৩৭]

কালকূট রচিত 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' গ্রন্থটি একটি কালজয়ী উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে এটি মাইলস্টোন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। আরো একটু বিশদ করে বললে বলা যায়, এই উপন্যাসটি যে শুধুমাত্র কালকূটকে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে তা নয়, এর পাশাপাশি সমরেশ নামে যে বিত্তহীন প্রতিভাবান লেখকটি জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত হচ্ছিলেন তাঁকেও বাংলা সাহিত্যের চিরায়ত আসরে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। এরপর আর এই লেখককে পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি, এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হলে লেখক পাঠক মহলে বিশেষ সম্মান পান। অন্যদিকে বছর দুয়েক আগে ('ভোটদর্পণ' ১৯৫২) কিছুটা তাড়াহুড়োতে নেওয়া 'কালকূট' ছদ্মনামটির একটি তাৎপর্য খুঁজে পান। ছদ্মনাম মূলত প্রয়োজনে নামের আড়ালে থেকে নিজেকে ব্যক্ত করা। কিন্তু এমন নামটি কেন? এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন—

> ''কার আজ্ঞায়, কে বা রাখে নাম। নাম, কালকূট। অর্থ যার তীব্র বিষ। ... এমন না যে সংসারেতে এসেছিলেম কিছু কথা বলবো বলে। বরং বলতে হয় 'আমি একদিনও না দেখিলাম তারে/আমার ঘরের কাছে আরশীনগর এক পড়শী বসত করে।'... গানখানি যে অর্থে লালন গেয়েছিলেন, বলতে গেলে একদিক থেকে আমারও সেই অর্থেই স্মরণ। আসলে তো আরশীনগরটি তাঁর আপন দেহ, পড়শীটি হলেন তাঁর সাধক সত্তা। যাকে তিনি সন্ধান করেছেন দেখতে চেয়েছেন।... কিন্তু আমি তো আর সাধক না।... বরং আমার আরশীনগর যদি হয় জগত ও জগতজন, তাদের মধ্যে আমার পড়শী সত্তাটিকে সন্ধানই নামের আড়ালে ঘুরে ফেরা। ... আড়াল দিয়ে খুঁজে ফিরি বোধহয় নিজেকেই। তারই নাম কালকূট।''[৩৮]

কিন্তু এমন নামটি কেন? অবচেতন মনের রহস্যময়তা ভেদ করে তার সিদ্ধান্ত উঠে আসে

কালকূটের কথনে—

> ''দেখলেই বোঝা যাবে, বুক ভরে আছে গরলে, আপনাকে খুঁজে ফেরা, আসলে তো হা অমৃত হা অমৃত! বিষে অঙ্গ জরজর, কোথা হা অমৃত!... কালকূট ছাড়া, আমার আর কী নাম হতে পারে?''[৩৯]

'কালকূট' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল প্রাণঘ্ন বিষ। সংশয় ও অবিশ্বাসের বিষে ভরা চতুষ্পার্শ্বে যেখানে অপ্রেমের হলাহল, সেখানে এই ছদ্মনামে রচিত উপন্যাসগুলি স্মরণ করিয়ে দেয় এক গভীর সত্যকে সন্ধানের জন্য অতিক্রম করে যেতে হবে এই বিষ জর্জর পরিপার্শ্বকে। তিনি দেখেছেন বিশ্বাসহীনতা, লোভ, ছোট ছোট স্বার্থ, এসবের কত কুৎসিৎ রূপ। পৃথিবীতে মানুষের থেকে বিচিত্র এবং বিস্ময়কর বলে আর কিছুকেই তাঁর মনে হয়নি। ভালো-মন্দ দুদিকেই। সেই মানুষকেই তিনি নিজস্ব উপলব্ধির নিরিখে দেখতে চেয়েছেন। এই ছদ্মনামে রচিত উপন্যাসগুলিতে লেখক মানুষের ভিড়ে যেমন বিচিত্রকে খুঁজছেন তেমনি নিজেকেও অনুসন্ধান করে চলেছেন। নানা মানুষের আকুলতা ও আর্তির মাঝখানে যেটা গুনগুনিয়ে ওঠে তা হল তুমি মনের মানুষ মনে অবস্থান করো। স্বনামের সীমানাতেই সমরেশ সমাজ রাজনীতির জটিল রূপকার। এই নামে তিনি বিভিন্ন রচনার রাজনীতির, কাপট্য বিশ্বাসের অভাব, অস্তিত্বের সংকট, প্রত্যেক অনুভবী মানুষকে বিচলিত করে। খুন, ধর্ষণ নিত্যদিনের জীবন যন্ত্রণার গ্লানি, মূল্যবোধের অভাব এগুলি। সামাজিক মানুষকে পীড়িত করে আর লেখক শিল্পীর সত্তাকে বিচলিত করে। সমরেশ লিখেছেন—''বিপন্ন মানুষই আমার নিরীক্ষার বিষয়।''[৪০] সমরেশের লেখায় উঠে আসে সমাজের বর্হিমুখী চরিত্র, কালকূট লেখেন মানুষের অন্তর্মুখী রূপ নিয়ে। মানবজীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলো তাঁর অনুভূতির আয়নায় উঠে আসে। উঠে এসেছে মানুষের বিচিত্র জীবনধারা, তাদের হাসিকান্না, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি এবং জীবনের ছবি। কালকূট নামে রচিত উপন্যাসগুলিতে মানুষের সামাজিক রূপের চাইতে তার অন্তর্জীবনের আকাঙ্ক্ষার কথাটি তুলে ধরেছেন। দুই নামে অর্থাৎ স্বনামে ও ছদ্মনামে লেখাগুলির মধ্যে উপস্থাপনগতও প্রকাশভঙ্গির পার্থক্য রয়েছে।

বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে কোন জিনিসকে বিশ্লেষণ করে থাকেন। বিশ্লেষণ অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন করে করে দেখা। অথবা চুলচেরা বা তন্ন তন্ন করে দেখতে চাওয়া। সমরেশ নামঙ্কিত লেখাগুলি ঠিক এইরকম। আর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি হল একেবারে

অন্যরকম। এঁরা সেই একই জিনিসকে সমগ্রতার ধারণায় দেখতে চান। যেখানে খুঁটিনাটি তথ্যের প্রয়োজন নেই, দৃষ্টি মাত্রেই যেন অনুভব করে নেন। কালকূট হলেন এই দ্বিতীয় শ্রেণির। তিনি সংবেদনশীল, স্পর্শকাতর, অনুভূতিসম্পন্ন, চেতনার তীব্র বোধে নিজেকে খুঁজে ফিরেছেন আর আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন প্রতিনিয়ত।

অনেকেই স্বনামে রচিত রচনা সম্ভারের সঙ্গে কালকূট নামে রচিত রচনার তুলনামূলক বিচার করে লেখককে চিনতে চেয়েছেন। কারণ সমরেশ নামাঙ্কিত রচনায় যেখানে সমাজ বিশ্লেষণ, চরিত্রের জীবন সংগ্রামের যন্ত্রণা, কালকূট সেখানে চরিত্রের অন্তর্মুখীন পরিচয়ের সন্ধানে যাত্রা করেন। দুটি নতুন পরিসরে লেখকের পৃথক যাত্রা জগৎ ও জীবনকে জানার সঙ্গে সঙ্গে চলে নিজেকে জানার প্রচেষ্টা। প্রথম শ্রেণির লেখায় লেখক জীবন পর্যবেক্ষক, নাগরিক, ভোগবাদী জীবনের সমালোচক; দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখায় তিনি অনেকটা বাউলের মতো মনের মানুষের সন্ধানী, মানুষের অন্তর্জীবনের আবিষ্কর্তা ও ভাষ্যকার। কোন কোন উপন্যাসে একই সঙ্গে বাউলবৃত্ত ও নাগরিকবৃত্তের জীবনকথাকে তিনি সুন্দর পরিকল্পনায় মিলিয়েছেন। নাগরিক চরিত্রগুলির ভিতর সুনিপুণভাবে বাউল ভাবনার বীজকে তুলে ধরেছেন। কালকূট তাঁর অন্তরে বাউল বলেই বোধহয় বাউল চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তুলেছেন সুনিপুণ দক্ষতায়। এইভাবেই কালকূট ও সমরেশের স্পষ্ট একটা পার্থক্য প্রতীয়মান হতে থাকে। কালকূট ঘরানার, শুরু তাঁর কালজয়ী উপন্যাস 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' থেকে। 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' (১৯৫৪) থেকে 'পূর্ণকুম্ভ পুনশ্চ' (১৯৮৮) -এর যাত্রাপথের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে লেখকের এক ভিন্ন অস্তিত্বের প্রবাহ। এই জীবনশিল্পীর এক ব্যতিক্রমী অনুভব ও দর্শন সমস্ত পাঠককে আলোড়িত করে। লেখক মানুষের দুটি মনের কথা বলেন। একটি হল তার সামাজিক মন, অন্যটি মরমীয়া মনের তৃষ্ণা। যে তৃষ্ণার জন্যই কালকূটের দেখা কেবল চোখের দেখা না, তার বিস্তার ঘটে চিন্তার গভীরে। তাঁর অভিজ্ঞতার বিস্তার শুধুমাত্র স্থানিক নয়, কালিকও বটে। তাই ভ্রমণের প্রথাগত ছক ভেঙে কালকূটের মানস ভ্রমণ সাহিত্যের ইতিহাসে এক অভিনব সংযোজন। সমরেশ কালকূট নামে প্রথমাবধি যে বাস্তব জগতের ভ্রমণ কাহিনি লিখেছিলেন পরবর্তী সময়ে সেই রচনারীতির পরিবর্তন ঘটে যায়। ১৯৭৭ থেকে কালকূট যে ভ্রমণ কাহিনীগুলি লিখলেন তা একান্তভাবেই মানস ভ্রমণ। তার সূচনা হয়েছিল 'শাম্ব' থেকে। এটি শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। 'শাম্ব' এর পরে 'পৃথা', 'প্রাচেতস', 'অন্তিম

প্রণয়', 'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি' প্রভৃতি গ্রন্থে এই মানস ভ্রমণের পরিচয় বর্তমান। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যায়, যথা—

> ''কালকূটের অভিজ্ঞতার বিস্তার স্থানিক নয় কালিক ও বটে। যে বিস্ময় স্থানগত তার কথা ছাড়িয়ে যায় যে বিস্ময় নিহিত রয়েছে কালগত পশ্চাদপসরণে। দিগন্ত অভিসার যত বড় কথা, যুগান্ত পরিক্রমা তার থেকে কম কথা নয়। আসলে যে বিস্ময় জীবনাগত তার তো কোনো স্থান কাল ভেদ নেই। এবং আরেকটু ভিতরের দিকে তাকালে বোঝা যায়, এ হল উদ্‌ঘাটন জনিত বিস্ময়। কালে কালান্তরের ধূসর প্রদোষে মহাজীবনের ছায়াপথে যে সব কথা স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, কালকূট তাদের আবার সচল করে তোলেন।"[৪১]

সমরেশ-কালকূটের সব লেখার মূলে যে ইচ্ছেটা সজাগ থাকে তা হলো বৈচিত্র্যের প্রতি টান। আর এই টানে মানুষের মন কখনোই এক স্থানে বন্দি হয়ে থাকতে চায় না, বেরিয়ে পড়ে পথে। কারণ পথেই, তার মুক্তি। বহুব্যাপ্ত জীবনাভিজ্ঞতার টুকরো টুকরো ছবি পাঠককে মুগ্ধ করে। আসলে কালকূটকে জীবনের ঘাটে ঘাটে পথে বাঁকে যে থামতে হয়েছে অনেকবার। কবে থেকে এবং কেন কালকূটের এই অতীতকালের পরিক্রমা শুরু হয়েছিল তা জানতে কালকূটের অধ্যাপক বন্ধু সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণাপন্ন হতে পারি। যথা—

> '' 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'—রচনার সময়েই কালকূট আকৃষ্ট হয়েছিলেন পুরাকথার গহন রহস্যে ডুব দেওয়ার জন্য। বস্তুত পুরাণোক্ত অমৃত কুম্ভের সন্ধানে অবগাহনের ফলে তিনি যা পেয়ে যাবেন তার দাম অমৃতকুম্ভের থেকে কম নয়।... আধুনিক কবি যে তাৎপর্যে অতিকথা বা 'মীথ'কে আকর্ষণ করেন, কালকূটের কৌশল তা থেকে স্বতন্ত্র। ... কালকূট আধুনিক কালের দর্পণে পুরাণকে প্রতিফলিত করেন না। তিনি পুরাণের দর্পণে আধুনিক মানুষের যন্ত্রণার প্রতিচ্ছায়া খুঁজে নিতে চান।"[৪২]

বাইরের দেশ-কালকে ছাড়িয়ে রয়েছে যে অন্তরময় মানুষ, কালকূটের সমস্ত গল্পের মূল অন্বিষ্ট হলো সেই মানুষ। কালকূট রচনা সমগ্র-র মূলকথাই হলো বিচিত্র পরিবেশ পরিস্থিতিতে মানুষের বিচিত্ররূপ পর্যবেক্ষণ আর অন্তঃসত্যের অন্বেষণ। গল্পের পটভূমি যাইহোক, সঙ্গী যিনিই হোন না কেন, বস্তুত বিষয় হিসেবে উঠে আসে বিচিত্র মানুষ এবং তাদের মনের

বিভিন্ন ভাবনা তরঙ্গের ছবি। কালকূট মনে করেন বহু বিচিত্রের মধ্যে মানুষের চেয়ে বিচিত্র আর কিছু নেই। এই বিচিত্রের মাঝেই তাঁর অপরূপের দর্শন ঘটেছে। তাঁর কথনে—

> ''যখন কোন নিঃশব্দ নিরালা মুহূর্তে, বিস্ময়ে বেদনায় আনন্দে লক্ষ্য করেছি, এক প্রসন্নময়ের আবির্ভাব ঘটেছে আমার চোখের সামনে, তখনই অবাক হয়ে দেখেছি, সে আর কেউ নয়, মানুষ! তাকে ছাড়িয়ে কোনো অপরূপের দর্শন আমার ঘটল না। তাই আমার সব নমস্কার মিলিয়ে এক নমস্কার নিয়ে ফিরেছি বারংবার তারই দরজায়।''[৪৩]

বিচিত্রতার পটে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে বহু মানুষের মধ্যে তিনি খুঁজে ফেরেন মানুষের ভিতরের মানুষকে আর তার সঙ্গে তাঁর কাছে খুলে যায় নিজেকে চেনার নিজেকে জানার পথ। বলা হয় মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের এর ওপরে 'মন'-এর স্থান। আবার 'মন'-এর থেকেও শ্রেষ্ঠ হলো 'আত্মা' তাকে জেনে তবে অন্যকে জানার চেষ্টা। কালকূট বহু মানুষের বৈচিত্র্যের মধ্যে মানুষকে দেখেছেন তার সঙ্গে নিজেকে বুঝেছেন। ঠিক রবীন্দ্রনাথের গানেও আমরা এই উপলব্ধির প্রতিধ্বনি শুনতে পাই— 'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না, সেই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।' কালকূট বাইরের অজস্র সাধারণের মধ্যে ভেতরের মানুষকে খোঁজেন। সন্ধানী মানুষের বোধকে খুঁজতে চেয়েছেন। যার ব্যাখ্যা আরো একটু গভীরভাবে পাই 'কালকূট ঃ অন্তহীন অন্বেষণ'-এ স্নেহাশিস ভট্টাচার্যের আলোচনায়, যথা—

> ''নিজেকে জানা তাঁর উদ্দেশ্য ঠিকই; কিন্তু তিনি তাঁর 'আত্ম'-কে বিধৃত দেখতে পান সমগ্র দেশ ও কালে পরিব্যাপ্ত অবস্থায়। সেই দেশ ও কালে পরিব্যাপ্ত মানবসত্তাকে উপলব্ধি করতেই বারংবার তীর্থ-গ্রাম-শহর- প্রকৃতি-পুরাণ সন্নিধানে তাঁর ছুটে যাওয়া। এভাবেই নিজেকে জানার অনিঃশেষ প্রচেষ্টায় তিনি 'মানুষ'-এর কাছে ছুটে গেছেন। তাঁর রচনাসমগ্রের পাতায় পাতায় এ জন্যই রয়ে গেল দেশ-কাল-ধর্ম-জাত-গোষ্ঠী নিরপেক্ষ এক শাশ্বত মানবসত্তার ছবি যে সত্তার পথ চলার সঙ্গে তাঁর আপন অন্বেষণ মিশে গিয়েছিল বার বার। সমগ্র জীবন জুড়ে তাঁর সৃষ্টিকর্মে ধ্বনিত হয়ে রইল তার সেই আত্মজিজ্ঞাসা অথবা জীবনাজিজ্ঞাসার আর্ত অন্বেষণ—খুঁজে ফিরি সেই মানুষে।''[৪৪]

আবার দেখতে দেখতে যখন বিস্ময় বোধ করেছেন তখন সমগ্র দেখার মধ্যে এক অতীন্দ্রিয়

সত্তাকে অনুভব করতে চেয়েছেন। এক দার্শনিকের মতোই চলতে থাকে তাঁর আত্ম-অন্বেষণ।

অতএব বলা যায় সমরেশের দৃষ্টিভঙ্গি ও কালকূটের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্নতর। সমরেশ যেখানে নাগরিক জীবন ও ব্যক্তি মানুষের নানা সমস্যা, যন্ত্রণা ও জীবন বিশ্লেষণে নিয়জিত, কালকূট সেখানে এক পথ পাগল বাউল, চলার আনন্দে পথের দু'ধারের অফুরাণ আনন্দ খুঁজে নিচ্ছেন, আর সেই সঙ্গে চলছে তার নিজের অনুভূতি মালার ক্রম সম্প্রসারণ। সমরেশ সমাজ সমালোচক, তীক্ষ্ণ কথার ধারে সমাজের চুলচেরা বিশ্লেষণে ব্যস্ত। কালকূট তাঁর আত্মস্বরূপকে, অচিন সত্তাকে খুঁজে পেতে ঘরের বাইরে বেরিয়েছেন। অন্বেষণ করেছেন মনের মানুষকে, যার মূলে রয়েছে প্রেমধর্ম। 'খেলছে মানুষ দেখগে তোরা' নামক নিবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন—

> ''একটি বিশ্বাসের কথা তোলা যেতে পারে। প্রাণী হিসাবে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণ করে, প্রেম তার সহজাত। প্রেম মানুষের স্বভাবধর্ম। আবহমান কাল থেকে, মানুষের এই স্বভাবধর্মই, সমস্ত সঙ্কটের মধ্যেও, পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রেখেছে।''[৪৫]

এই প্রেমময় মানুষের অন্বেষণেই লেখকের বিকাশ ঘটেছে। কঠোর সংগ্রামের পর জীবন রসে সিক্ত মানুষের প্রকৃত রূপ তাঁর লেখায় ঘুরে ফিরে এসেছে। তিনি নিরপেক্ষ থেকে শিশুর মতো কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে এঁদের পর্যবেক্ষণ করেছেন। চরিত্রগুলিকে হুবহু তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিভিন্ন বয়সে লেখকের প্রেক্ষাপটের চিন্তা ভাবনা পরিবর্তিত হয়েছে। তাঁর রচনার ক্রম পর্যায়ে এক সময় প্রত্যক্ষ কাহিনি বর্ণনার পাশাপাশি এসেছে, মনোময় মানুষ, আত্মসমীক্ষক মানুষ, নিজের কাছে নিজেরই হিসাব নিকাশের জন্য উদ্বিগ্ন মানুষ। যেদিন থেকে এরা কালকূটের উপন্যাসের সুতীক্ষ্ণ পরীক্ষার বিষয় হয়ে উঠলো, সেদিন থেকেই অর্ন্তময় গূঢ় জগৎ তাঁর লেখাতে প্রভাব বিস্তার করছে।

সমরেশ তাঁর লেখক জীবনের প্রথম পর্যায়ে যা কিছু লিখেছেন সেই তুলনায় পরের দিকের লেখাগুলি অভিজ্ঞতায়, ভাবনায় অনেক বেশি ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে। রচনাকারেরও জীবনদৃষ্টিগত পরিবর্তন ঘটেছে। একই মানুষ একই সময়ে বিপরীতধর্মী দু-রকম লেখায় নিজেকে প্রকাশ করেছে, অথচ কত ভিন্নরূপে কতো ভিন্নতর জিজ্ঞাসায়!

সমরেশ লেখক হিসেবে নিজেকে অনবরত পাল্টেছেন। কোনো এক জায়গায় থেমে থাকেননি। এই পৃথিবী সম্বন্ধে, দেশ সম্বন্ধে, মানুষ সম্বন্ধে যে কত সজাগ তাঁর দৃষ্টি, তার

প্রমাণস্বরূপ বলা যায় তাঁর বিষয়বস্তুর ক্রমশঃ পরিবর্তন। এই দুই নামের লেখকীয় ভঙ্গির তুলনা টানতে গিয়ে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন—

> ''কালকূটের মন সরল, চোখ গরলহীন, সে অভিযাত্রী, সহজ এক জীবনধর্ম নিয়ে তার কারবার। সমরেশ অনেক বেশী জটিল, গলিঘুঁজির ভিতর দিয়ে তার সর্পিল পথ।''[৪৬]

লেখক জীবনভর লিখতে লিখতে নিজেকে বারবার ভাঙেন, গড়েন, সেই কারণেই যে সমরেশ 'গঙ্গা', 'বি.টি. রোডের ধারে' লেখেন তিনিই 'বিবর', 'প্রজাপতি', 'পাতক' লেখেন। আবার তাঁর প্রথম জীবনের উপলব্ধি, কমিউনিস্ট পার্টির অভিজ্ঞতা নিয়ে 'মহাকালের রথের ঘোড়া', 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে'-র মতো সব আশ্চর্য উপন্যাস নিয়ে ফিরেও আসেন। আসলে প্রকৃত লেখক বারবার নিজেকে বদলাতে চান। যে পথে তাঁর সহজসিদ্ধি সেই পথকে পরিহার করে নতুন পথের অন্বেষণ করে ফেরেন।

'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে', 'নির্জন সৈকতে'র কালজয়ী কালকূট এবং অন্যদিকে 'উত্তরঙ্গ', 'বি.টি. রোডের ধারে', 'গঙ্গা', 'শ্রীমতী কাফে'র সংগ্রামী সমরেশ সমানভাবে তখন সাহিত্য মহলে আলোড়ন ফেলেছেন। পাশাপাশি লিখে চলেছেন উৎকৃষ্ট ছোটগল্প। কালপ্রবাহই হলো সমরেশের মানব গঙ্গার অভ্যন্তরীন স্রোত, যা তাঁকে বারবার বাঁক নিতে সাহায্য করেছে। ভাঙন ধরা গ্রামীণ জীবন আর আগ্রাসী শিল্পাঞ্চলের চৌহদ্দিতে কৃষক শ্রমিক মজদুর শ্রেণির কাহিনী আপাতত এসে 'গঙ্গা'য় (১৯৫৭) শেষ হয়ে যায়। 'উত্তরঙ্গ'-এর উত্তরপর্ব স্বরূপ 'জগদ্দল' (১৯৬৬) তখনো আড়ালেই ছিল। সমরেশ তাঁর সাহিত্য জীবনের একটা বড় রকমের বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে কিছুটা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন 'বাঘিনী' (১৯৬১), 'ত্রিধারা' (১৯৫৬) উপন্যাসের মধ্যে। তাঁর মধ্যে তৈরি হয়েছে নতুন জিজ্ঞাসা, তিনি কোন দিকে এগোবেন?

পঞ্চাশের অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব এসে পড়ে ষাটের দশকেও। তখনও অব্যাহত থাকে উদ্বাস্তু সমস্যা, বেকারি এবং কালোবাজারি। ষাট দশকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। ১৯৬৬ সালের প্রথম দিকে দেখা দেয় খাদ্য আন্দোলন। সরকারি সামন্তবাদী ভূমিনীতি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য নীতির বিরুদ্ধে বামপন্থীরা খাদ্য আন্দোলন সংগঠিত করে। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, বিধানচন্দ্র রায় ও নেহেরুর মৃত্যু, চীনের সঙ্গে ভারতের পারস্পরিক সীমান্ত সংঘর্ষ, এবং ১৯৬৭ সালের ২২ শে মে উত্তর বাংলার তরাই অঞ্চলের নকশাল

আন্দোলনের সূচনা এ সমস্ত কিছুই সমাজ বদলের পাশাপাশি এনেছে সাহিত্য ক্ষেত্রে এক বড় রকমের পালাবদল। বিষয় ও বক্তব্যের বদল ঘটেছে। সমাজের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ব্যক্তি ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠছিল। একরকম অসহায়তা বোধ থেকে সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে সে হারিয়ে যাচ্ছিল নিজস্ব মনোজগতে। ব্যক্তির মধ্যেকার এই বিচ্ছিন্নতাবাদকেই উপন্যাসের অবয়বে বেঁধে ছিলেন ষাটের কথাসাহিত্যিকগণ। প্রত্যেক বিবেকী মানুষেরই একটা প্রত্যাশা থাকে। সমষ্টির কল্যাণ ও ব্যক্তির কল্যাণ সেই প্রত্যাশার ভিতরে হাত ধরে চলে। অথচ নবীন স্বাধীনতার এক দশকের মধ্যেই খাদ্য সংকট, উদ্বাস্তু সমস্যা, বেকারি, দেশের উন্নয়নের লক্ষ হীনতা ব্যক্তিকে এক নিরুপায় আত্মসংকোচনের পথে নিয়ে যায়। তবু তখনো কিছু সমাজ মনস্কতা ছিলো। তরুণদের উদ্দীপনা ব্যক্ত হয়েছিল প্রথম খাদ্য আন্দোলনে তারপর নকশালদের বিপ্লব প্রচেষ্টায়। কিন্তু এর বিপরীতে ছিল তথাকথিত স্বচ্ছল সমাজের ভোগ প্রবণতা; পশ্চিমী ভোগবাদ ষাটের দশক থেকেই এদেশের সমাজকে আক্রান্ত করেছে। অশ্লীল, বিবর, প্রজাপতি, পাতক প্রভৃতি উপন্যাসে সমরেশের যে ক্রোধ তা এই সমাজের বিরুদ্ধে ফেটে পড়েছে। সমরেশের এই পর্বের রচনাবলী আমাদের পৃথক মনোযোগ দাবি করে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য এখানে তুলে ধরা যায়, যথা—

> ''...রচনাগুলির মধ্যে আমরা দেখতে পাব আপন ব্যক্তি স্বরূপের পূর্ণ অবলোকনের জন্য সমরেশের অন্তবিহীন প্রয়াসের এক বিচিত্র পরিচয়। অন্বেষায় অধীর, বারম্বার আগুনের মুখোমুখি হবার সংকল্পে সুদৃঢ় এবং সেই সঙ্গে সমাজ ও ব্যক্তির অন্বয় ও অন্বয়ের জট জটিলতাকে প্রত্যক্ষ করার আগ্রহ ষাটের দশকের সমরেশকে করে তুলেছিল বেপরোয়া। এই দশকটাই ছিল বাংলা সাহিত্যের নানাদিকে নানা কেন্দ্র থেকে নানা প্রশ্ন আহরণের দশক। সেই প্রশ্নার্ত দশকে যেমন আত্মজিজ্ঞাসার চাপ ক্রমশ হয়ে উঠেছিল প্রবল থেকে প্রবলতর, তেমনি ইতিহাসের কাছে গিয়েও হাজির হবার দায় ছিল সামাজিক কারণেই অপরিহার্য।''[৪৭]

সাহিত্য জীবনের ঠিক মধ্য দশায় 'বিবর' (১৯৬৫) উপন্যাসের মধ্যে সমরেশের সর্বাঙ্গীন স্বকীয়তার দ্বিধাহীন প্রকাশ ঘটে। এই সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয় 'স্বীকারোক্তি' (১৯৬৭), 'প্রজাপতি' (১৯৬৭), 'পাতক' (১৯৬৯), 'বিশ্বাস' (১৯৭০) নামক উপন্যাসগুলি। এমনকি

‘মানুষ’ বড়গল্পটিও এই বিবর বৃত্তের মধ্যে পড়ে। এই সব কটির মধ্যে বাংলা তথা ভারতের ষাটের দশকের পালাবদল প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। সমরেশ এখানে হয়ে উঠেছিল দুর্বার, দুঃসাহসী, প্রথাবিরোধী, অপ্রিয় সত্যভাষী এবং সর্বাধিক বিতর্কিত লেখক। তবে ইতিপূর্বে ‘স্বীকারোক্তি’ নামে একটি ছোটগল্পে তাঁর আত্ম-উন্মোচন ঘটে। এর মধ্যে প্রথম, লেখকের আত্মানুসন্ধানের আর্তি ফুটে উঠেছিল। ‘স্বীকারোক্তি’ গল্প সম্পর্কে লেখকের নিজের কথায় বলা যায়—

> ‘‘জীবন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, অতএব সাহিত্য চর্চাও এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। স্বনামে ও ছদ্মনামে, ‘অমৃতকুম্ভর সন্ধানে থেকে, মৎসজীবিদের সঙ্গে জীবন কাটিয়ে ‘গঙ্গা’ উপন্যাস পর্যন্ত একটা পর্যায় বলা যায়। সেই সময়ে আমার মনে এক নতুন জিজ্ঞাসা জাগিয়ে দিয়েছিলেন একজন বর্ষীয়সী মহিলা। তিনি বলেছিলেন, কেবল মানুষের জীবনকে জানবার জন্যই কি তুমি লেখ? নিজেকে জানবার জন্যও কি তোমার লেখা উচিত নয়? সাহিত্যচর্চা যে জীবনচর্চারই একটি ক্ষেত্র, আমি আবার তা নতুন করে অনুভব করেছিলাম। শুরু হয়েছিল, লেখার মধ্যে আত্মদর্শনের পালা। যার প্রথম ফলশ্রুতি, ষাটের দশকের গোড়ায় লেখা আমার গল্প, ‘স্বীকারোক্তি’।[৪৮]

‘স্বীকারোক্তি’ গল্পে প্রথম, এক কমিউনিস্ট বন্দী, যার সামনে স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের বাঘা ইনভেস্টিগেটর, নির্দ্বিধায় সে নিজের কাছে ঘোষণা করেছিল, সত্যের স্বীকারোক্তি দেওয়া কখনো সম্ভব হয়নি। বাল্যে পিতা-মাতার কাছে, যৌবনে স্ত্রী বা প্রেমিকার কাছে এবং এখন পুলিশের কাছে। এই গল্প প্রকাশ হওয়া মাত্রই তিনি পার্টির দ্বারা সমালোচিত হন। এমনকি সাম্রাজ্যবাদের অনুচর এবং সি আই এর দালাল বলেও তাঁকে চিহ্নিত করা হয়। এর পরবর্তী কালে ‘বিবর’ (শারদীয় ‘দেশ’ পত্রিকায়, ১৯৬৫) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশ জুড়ে বাদানুবাদ শুরু হয়ে যায়। এরপর ১৯৬৭ তে ও শারদীয় ‘দেশ’ -এ প্রকাশিত ‘প্রজাপতি’ উপন্যাসকে কেন্দ্র করে আদালত পর্যন্ত জল গড়ায়। বলা যায় সমরেশের সৃষ্টিতে তখন ঢল নেমেছে। একই সময়ে তিনি ‘দেশ’ -এ কালকূট ছদ্মনামে ‘কোথায় পাব তারে’ লিখেছিলেন। আবার কিছুদিনের মধ্যে তিনি সবাইকে স্তম্ভিত করে পিতা-পুত্রীর যৌন সম্পর্ক নিয়ে ‘দেশ’-এ গল্প লেখেন ‘পাপ পুণ্য’। সব কটিই প্রায় ‘দেশ’ পত্রিকায় একের পর এক প্রকাশিত হচ্ছিল।

'আনন্দবাজার' এর কর্ণধার কানাইলাল সরকার এই রচনাগুলির বিষয়বস্তু একেবারেই পছন্দ করছিলেন না। তাঁর মনে হয় যে লোক 'কোথায় পাব তারে' লিখছে সে লোক আবার কি করে 'প্রজাপতি'র মতো উপন্যাস লেখেন। এই সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রে লেখকের নিজস্ব মতামত হলো—

> ''সমস্ত ষাটের দশক জুড়েই এই Self Identification -এর লেখা লিখতে গিয়ে প্রবল বিতর্ক ও আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। 'বিবর' বা 'প্রজাপতি' উপন্যাস নিয়ে আমার বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ আনা হয়েছিল। ... আসলে, আমি যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ, সেই মধ্যবিত্তের ঔপনিবেশিক মানসিকতা ও চরিত্রের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণই ছিল আমার লক্ষ্য। তুলে ধরেছিলাম আমার ও চারপাশের জীবনধারণ, ভাবনা চিন্তা ও সমাজের চিত্র। জীবনের নানান অন্ধকার ও বিকৃতির মধ্যে, আমি সত্যকেই সন্ধান করেছি। জীবন যাপনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন, পুরনো মূল্যবোধ তাতে আঘাত লেগেছে। কেউ কেউ সহজে তা গ্রহণ করতে পারেনি। এমন কি লেখনীর প্রচলিত ভাষার এক আমূল পরিবর্তনের চেষ্টাকেও অনেকে ধিক্কার দিয়েছেন। ... কিন্তু লেখকের তাতে কিছু আসে যায় না, সে আবার নতুন পথে জীবন চর্চার বাঁকে চলে যায়। অর্থাৎ লেখার ভাঙাগড়া চলতে থাকে।''[৪৯]

তবে 'বিবর' বৃত্তের উপন্যাসগুলিকে কেন্দ্র করে শুধুই নিন্দার ঝড় বয়ে যায় নি। অনেকে তাঁদের প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন যে 'বিবর' এর সব থেকে যেটা বেশি আকর্ষণীয় তা হলো এই উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষা। যা নিয়ে এই প্রথম কোনো লেখক রীতিমতো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ব্যবহার করেছেন। শহুরে চলতি শব্দকে লেখক এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যাতে একটা নতুন ধরণের ভাষার স্টাইল হয়েছে। বলতে হয় এই স্টাইল জীবন্ত এবং জীবনের অবিকল প্রতিচ্ছবি। তাই অশ্লীল বলার যৌক্তিকতাকে কোন ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না বলে দৃঢ় মন্তব্য করেন বিশিষ্ট সব সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, ড. নরেশ গুহ প্রমুখ। এই অশ্লীলতার ব্যাখ্যা-য় সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—

> ''শ্লীলতা অশ্লীলতা সামাজিক প্রশ্ন হতে পারে, নৈতিক প্রশ্নও হতে পারে—কিন্তু সাহিত্যিক প্রশ্ন হতে পারে না। 'অশ্লীল' বলে চেঁচামেচি করাই অশ্লীলতা যে

> ব্যক্তি সদাই নাকে রুমাল চাপা দিয়ে ঘোরে দুর্গন্ধকে সে-ই প্রচার সামগ্রী করে তোলে।... চরিত্র পাত্রের উক্তিকে নিয়ে রুচি-কুরুচির সওয়াল জবাব তুললে সাহিত্য ক্ষেত্রে সমস্যা বাড়ে বই কমে না। 'সধবার একাদশী'-র সংশোধিত রুচিশুদ্ধ পাঠ হাজির করতে চাইলে আর যাই পাই না কেন 'সবধার একাদশী' কে পাব না।... সমরেশ কথাগুলি বলছেন না। বলাচ্ছেনও না। চরিত্রগুলি পরিবেশ ও পরিস্থিতি সাপেক্ষে কথাগুলি বলছে। পরিস্থিতির শ্লীলতাও নেই, অশ্লীলতাও নেই। ... ষাটের দশকে নিদারুণ এক ধস্ত পরিবেশে ধর্ষকামী আক্রমণাত্মক চরিত্রের স্বগতোক্তি এবং একোক্তিকে সাধু সংলাপে রূপান্তরিত করতে চাইলে চরিত্রটি অশ্লীল হয়ে উঠত। সেটা যে সমরেশ করতে চাননি এ থেকে প্রমাণিত হয় সমরেশের চরিত্রজ্ঞান—এখানে শিল্পজ্ঞান।"[৫০]

সমরেশের ব্যক্তি জীবনেও ষাটের দশক ছিল সবচেয়ে টালমাটাল সময়। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে সমরেশ তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী, ধরিত্রীকে নিয়ে কলকাতায় নতুন সংসার পাতেন। একদিকে প্রথমা স্ত্রী গৌরীর প্রতি অপরাধবোধ ও অন্যদিকে দ্বিতীয়া স্ত্রী-র প্রতি তাঁর দায়িত্ববোধ। এই তুমুল টানাপোড়েনের মধ্যে, সংসার জীবনের অনিবার্য ভাঙচুরের ভেতর দিয়ে তিনি নিজেকে নতুন ভাবে চেনার চেষ্টা করছিলেন। মূল্যবোধের কঠিন সঙ্কটে ন্যায় অন্যায়, পাপ-পুণ্য সব ভেঙে যাচ্ছিল। সমরেশের নিজের কথায়, সাহিত্যিককে বেঁচে থাকতে হয় কেবল জৈবিক ভাবে নয়, আরো বহুতর বাধার বিরুদ্ধে। ব্যক্তিগত ঈর্ষা থেকে রাজনীতি এমনকি আত্মার আত্মজনেরাও এই ব্যূহ রচনা করে। জটিলতা বাড়ে, সৃষ্টি নতুন দিগন্তের সন্ধান করে। আর প্রতিষ্ঠা সংগ্রামকে তীব্রতর করে, কেবল বাইরে নয় ঘরেও। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরো একটি মন্তব্যকে এখানে তুলে ধরা যায়—

> ''সমরেশের সাহিত্যজীবনের প্রারম্ভিক পর্বে গোর্কি, লু সুন প্রমুখের হয়তো বা জ্যাক লণ্ডন বা হেমিংওয়ের দূরাগত স্পর্শ ন্যূনাধিক লক্ষ করা গেছে। কিন্তু সে সবই ছোটগল্পে। বি.টি. রোডের ধারেতে, গোর্কির লোয়ার ডেপ্থকে খুঁজে পেতে হলে কষ্ট করে খুঁজতে হয়। সমরেশ যে সব পাশ্চাত্য লেখকের টান পরবর্তী পর্যায়ে অনুভব করলেন তার মধ্যে প্রধান হলেন দস্তয়েভস্কি ও কামু।... মিথ অফ সিসিফাস সমরেশের মনযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। গোর্কি

> থেকে কামু অনেকখানি পথ। ঘুরপথও বটে। কেন এই যাত্রা? ষাটের দশকের পরিস্থিতির মধ্যে তার উত্তরের উপাদান আছে। এ এমন একটা সময় যখন অঙ্কপাত করে দেখা যাচ্ছে অতীত একটা দুটো নয়, অনেক ভুল মূল্যমানে ভুল ফল নিয়ে এসেছে। বর্তমান তাৎক্ষণিকতাকে চিরকালের আগে বসাতে চাইছে। ভবিষ্যৎ ধোঁয়াশায় ধূসর। ...নিশ্চয়তা বিহীন এই পরিস্থিতিতে... দিশাহারা উৎকণ্ঠ, স্বপ্ন সংকটাপন্ন ব্যক্তির যন্ত্রণা এসময়ে প্রাধ্যান্য পায়। ...'স্বীকারোক্তি', 'প্রজাপতি', 'পাতক' আর 'বিশ্বাস' -এর সঙ্গে 'বিবর' সব কটি উপন্যাসেই বাংলা তথা ভারতের ষাটের দশক প্রতিফলিত।"[৫১]

ষাটের দশক শেষ হয় বহু আশা ও স্বপ্ন নিয়ে। সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার ডাক দিয়েছিলেন নকশালবাড়ি আন্দোলনের নেতারা। ভারতবর্ষের রাষ্ট্র নীতির শ্রেণি চরিত্র বিচার করে এই রাষ্ট্র মন্ত্রকে পরিবর্তনের ডাক দেওয়া হয়েছিল। নকশালবাড়ি আন্দোলনের তাত্ত্বিক নেতা চারু মজুমদার গ্রাম দিয়ে শহরকে ঘেরার নীতি ঘোষণা করলেন। গ্রামের গরীব কৃষক ও চা-বাগানের শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করে জোতদার শ্রেণির বিরুদ্ধে লড়াই করবার নীতি নকশালবাড়ির নেতারা গ্রহণ করলেন। সেই আন্দোলনের ডাক কেবল শ্রমিক কৃষক শ্রেণিকে নয় নগর কলকাতার ছাত্র যুবা এবং বিপ্লবের জন্য অপেক্ষামান মানুষকেও এই আন্দোলনের স্বপক্ষে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। একটা উত্তেজনা কর পরিস্থিতির মধ্যে নেতাদের ডাকে জীবন মরণ তুচ্ছ করে সারা দেশে অভূতপূর্ণ গণ জাগরণের ঢেউ উঠেছিল। কিন্তু যে উদ্যমে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা দীর্ঘস্থায়ী হল না। শ্রেণি শত্রু খতম করার নীতি এবং রণ কৌশল স্থায়ী দীর্ঘ মেয়াদী সফলতা পেল না। নকশাল আন্দোলনকে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পুলিশী সন্ত্রাসের দ্বারা বিধ্বস্ত করে ফেলল। ফলে যে উৎসাহ তৈরি হয়েছিল তা ফলপ্রসূ হল না।

যে রাষ্ট্র যন্ত্রের নীতির বিরুদ্ধে কৃষক শ্রমিক দরিদ্র মানুষের স্বপক্ষে নকশাল নেতারা আন্দোলন শুরু করেছিলেন অচিরেই কংগ্রেস সরকার তাকেই তাদের নীতি হিসেবে গ্রহণ করে। ইন্দিরাগান্ধী 'গরিবি হটাও' শ্লোগান দিলেন। সরকার কিছু উন্নয়ন মূলক নীতি গ্রহণ করল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষের বিরাট জনসংখ্যার উন্নতি বিশেষ কিছু হল না। বরং আন্তর্জাতিক অর্থনীতির প্রকোপে ভারতের অর্থনীতিতে সংকট ঘনিয়ে ওঠে। বেকারি বাড়তে থাকে। কলকারখানায় বহু শ্রমিক ছাঁটাই হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিরোধীরা যথেষ্ট চাপ তৈরি

করে। ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। দেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা তৈরির অজুহাতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। বিরোধী নেতারা অনেকেই গ্রেফতার হন। অনেক বুদ্ধিজীবী মানুষ—যাঁরা এই রাজনীতির সমালোচনা করতেন—তাদেরও এ্যারেস্ট করা হয়। ১৯৭৭ এর নির্বাচনে ইন্দিরাগান্ধী পরাজিত হন। বিরোধী জনতা দল দিল্লির ক্ষমতায় আসে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতা দখল করে। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি বা বৈদেশিক ঋণকে আয়ত্তে আনা গেল না। তাই সত্তর দশকের শেষে দেখা দিল ভয়াবহ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট। নকশাল আন্দোলন এদেশে ব্যক্তি হত্যার রাজনীতিকে লাগামহীন করে তুলেছিল। এখন নকশাল আন্দোলন স্তিমিত হবার পর দুর্বৃত্তের হাতে নিতান্ত ছেলেখেলা হয়ে দাঁড়ায় ব্যক্তি হত্যা, স্বার্থপরতা, মূল্যবোধহীনতা, খুনোখুনি ছড়িয়ে পড়ল। এরপর এল রাজনৈতিক জমি দখলের লড়াই। সমরেশ বসুর অনেক লেখায় এই ব্যক্তি হত্যা এবং রাজনৈতিক হত্যার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।

সত্তর দশকে জাতীয় রাজনৈতিক ঘটনাবলী মানুষের জীবনকে সুস্থিত হতে দেয়নি। নকশাল দমনের নামে সরকারি ভাবে নরহত্যা, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য পুলিশ ও ক্যাডার বাহিনীর দ্বারা প্রতিপক্ষকে সংহার করা—জনজীবনে তার ব্যাপক প্রভাব পড়ে। হত্যা-প্রতিহত্যার রাজনীতি ব্যক্তি জীবনের স্থায়িত্বকে বিনষ্ট করে দেয়। এসবের গভীর ও দূরপ্রসারী প্রভাব মানুষের চিন্তাচেতনাকে প্রভাবিত করে—তার জীবনজাপনের প্রণালীকেও বদলে দেয়। জরুরি অবস্থা জারি করে রাজনীতিতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা গণতন্ত্রের উপর প্রবল আঘাত হানে। মূলত রাজনৈতিক উত্থান-পতন, আকস্মিকতা-জাত জটিলতা, অনিশ্চয়তা ও উত্তেজনা সত্তর দশকের ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। জন জীবনে নেমে এসেছিল অস্থিরতা ও বিভ্রান্তি। জীবনের এই ওঠা পড়া বা মরা-বাঁচার কাহিনি সাহিত্যের পাতায় সেদিন প্রতিফলিত হয়। সত্তরের সাহিত্যিকরা সেদিনের সামাজিক অবক্ষয়, মূল্যবোধের বিনষ্টি, অর্থনৈতিক চাপের দ্বারা পিষ্ট মানুষের কথা বাংলা উপন্যাসে তুলে ধরেছিলেন। যেমন—নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'উপনগর', আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'সমুদ্র সফেন' প্রমথনাথ বিশীর 'পনেরোই আগষ্ট' শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'উজান' নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'পিতৃপুরুষ' মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' 'অগ্নিগর্ভ' ইত্যাদি।

সত্তরের দশকে যখন নকশাল আন্দোলনের কারণে পশ্চিমবাংলার শহর ও গ্রাম

ব্যাপকভাবে তোলপাড় হয়ে উঠেছে সেই সময় সমরেশ উত্তর কোলকাতায় দেশবন্ধু পার্কের কাছে একটি ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। বাড়ির গোটা দেওয়ালে নকশালপন্থীদের পোষ্টার ভরা ছিল, কোনও নিরাপত্তা ছিল না। এরই মধ্যে ওখানে পর পর তিন চারটি হত্যাকাণ্ড ঘটে যায়। যার মধ্যে কোনওটা চলত নকশালদের নামে, কোনওটা সমাজ বিরোধীদের নামে। প্রকৃত আততায়ীকে চিহ্নিত করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। সেই সময় পুলিশের এক কর্তা ব্যক্তির অনুরোধে সমরেশ আনন্দবাজারের অশোক কুমার সরকারের বাড়িতে বেশ কিছুদিন ছিলেন। এই পর্বে সমরেশ সমস্ত বিচ্ছিন্ন অন্ধকার কাটিয়ে উপনীত হয়েছেন তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক বক্তব্যে। 'মহাকালের রথের ঘোড়া' থেকে যার সূত্রপাত এবং বিস্তার ঘটেছে 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' বা 'তিন পুরুষ' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে যার বিস্তার ঘটেছে। এই প্রত্যয় নিষ্ঠ উপন্যাসগুলি সমরেশকে সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকালের জন্য স্থান করে দিয়েছে। এই সময় নামী একটি পত্রিকার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কারণে 'প্রসাদ' পত্রিকায় লেখা দেওয়ার জন্য তাঁকে ভ্রমর ছদ্মনাম গ্রহণ করতে হয়। তিনি ধারাবাহিকভাবে ঐ পত্রিকায় লিখেছিলেন 'পৃথা', 'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি', 'অন্তিম প্রণয়', 'জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য' উপন্যাসের তিনটি পর্ব। ১৯৭৬ সালে পৌরাণিক পটভূমিকায় কাহিনি লেখার সময় তিনি নতুন এই ছদ্মনামটি নিয়েছিলেন। এছাড়াও এই ভ্রমর নামে যে রচনাগুলির প্রকাশ হয় সেগুলি যথাক্রমে—'জনক', 'বাসন্তীর সংসার', 'শেষ অধায়', 'মরম ভরম' ইত্যাদি। সমরেশের সাহিত্য জীবন মোটামুটিভাবে ১৯৪৬ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই চল্লিশ বছর তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণির আশা ও আশাভঙ্গের ইতিহাস। তাদের নিজস্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ও তার ব্যর্থতা। তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক ভিতটি ছিল বিপর্যস্ত। দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, মূল্যবৃদ্ধি অন্যদিকে যুদ্ধোত্তর সংকট, দেশবিভাগ সমগ্র শ্রেণিটিকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেছিল। কিন্তু অন্যদিকে জাতীয় আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, ভবিষ্যৎমুখী মূল্যবোধে এই শ্রেণি তার তাৎপর্য হারায়নি, আকাশে নতুন মুক্তি খুঁজেছে। এই রকম এক সময়েই সমরেশ বসু সাহিত্য জগতে পদার্পণ করেন। নানা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও একটি নির্বিশেষ মানবিকতা ছিল তাঁর মূলধন। ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা, যন্ত্রণা-আনন্দ, ভীরুতা আত্মিক সংকট সাহস লড়াই সমস্তই এক বৃহত্তর পর্যায়ে তাঁর লেখাগুলিতে উঠে আসে।

সময় সমাজ অভিজ্ঞতার পরিবর্তন একজন লেখককে সব সময়ই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের

দিকে নিয়ে যায়। যেমন সমরেশ বসুর ক্ষেত্রেও তাঁর লেখক জীবনের প্রথম পর্বের সঙ্গে পরবর্তী সময়ের পরিবর্তনশীল বিষয় ও চিন্তাধারার তুলনা টানলেই বোঝা যায়, ক্রমশঃ লেখাগুলির মধ্যে প্রকাশ পায় লেখকের মধ্যে ঘটে যাওয়া এক মৌলিক পরিবর্তন। তাঁর সাহিত্য জীবনকে কয়েকটি পর্বে বিশ্লেষণ করা যায়। এই পর্বগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাবো ক্রমাগত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন। যেমন—

প্রথম পর্ব : 'নয়নপুরের মাটি থেকে 'গঙ্গা'।

দ্বিতীয় পর্ব : 'বিবর', 'প্রজাপতি', 'পাতক', 'স্বীকারোক্তি'।

তৃতীয় পর্ব : 'মহাকালের রথের ঘোড়া', 'যুগ যুগ জীয়ে', 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে', 'তিন পুরুষ'।

চতুর্থ পর্ব : এক নতুন রূপের প্রকাশ, যা দুর্ভাগ্যবশত অসমাপ্ত থেকে যায় 'দেখি নাই ফিরে'। এর পাশাপাশি লিখেছেন প্রায় দুশো ছোটগল্প যা উপন্যাসগুলির মতোই জীবন চেতনা, মনস্তত্ত্ব, রাজনীতি ও সমাজ চেতনায় ঋদ্ধ।

কালকূট নামে রচিত উপন্যাসগুলিকে মূলত পাঁচটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। যেমন— প্রথম দিকের রচিত উপন্যাসগুলিকে নিয়ে বলা যায়—তীর্থ বা মেলা পরিক্রমা। এরপর প্রেক্ষাপট অরণ্য, পুরাণের অনুষঙ্গে মানসভ্রমণ, নগর জনপদ অভিজ্ঞতা, বিচিত্রের সন্ধান। স্বনামে লেখাগুলির পাশাপাশি 'কালকূট' ও 'ভ্রমর' ছদ্মনামেও তিনি খ্যাত হন। বিশেষত কালকূট ঘরানার লেখাগুলির স্বাদ ও সুর একেবারে ভিন্ন মাত্রার। কালকূটের সামনে আমরা দেখি এক দিগন্ত বিস্তারী বিশাল ক্যানভাস। যেখানে ভেসে ওঠে চলমান জীবনধারা এবং সেই আত্মপরিচয়হীন মুক্ত মানুষের মেলায় তিনি খুঁজে ফেরেন আপন অন্তরসত্তাকে। কালকূট সাহিত্যকেও বেশ কয়েকটি পর্বে শ্রেণি বিভাজন করা যায়। কালকূট ঘরানার জন্ম নেয় 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' রচনা থেকে। এই অমৃতকুম্ভ থেকে 'পূর্ণকুম্ভ পুনশ্চ' পর্যন্ত লেখকের একটি ভিন্ন অস্তিত্বের প্রবাহ বয়ে যায়। এই ভাবেই স্বনামের পাশাপাশি কালকূট হয়ে ওঠেন এক ভিন্ন জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যাতা। একদিকে সমরেশ যেখানে সমাজ ও রাজনীতির জটিল রূপকার অন্য দিকে কালকূট বাউল মনের পথিক। কালকূটের রূপের সন্ধানই হলো তাঁর আত্মানুসন্ধানের নামান্তর। এখানে বলা যায় মানুষকে পর্যবেক্ষণ করার পৃথক দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যই সমরেশ ও কালকূটের ভিতর সূক্ষ্ম ভিন্নতা সৃষ্টি করেছে। অশ্রুকুমার শিকদার তাঁর

'বিশ্বাসের সংকট ও সমরেশ বসু' নামক প্রবন্ধে বলেন— ''একজন মানুষের এই নিঃসঙ্গ মেধাবী আত্মানুসন্ধান, নিজেকে অনবরত ভেঙে ভেঙে নতুন নতুন করে সৃষ্টি পাঠকের মনে শ্রদ্ধাবোধ না জাগিয়ে পারে না।"[৫২] মানুষের মধ্যে অমৃতসন্ধানী কালকূট মানুষের বিশ্বাস, সংস্কার, জীবনজিজ্ঞাসা, জীবনদর্শন প্রভৃতি সবকিছুর ভিতরে অমৃতের পরশ খুঁজে ফিরেছেন এবং এজন্য তিনি প্রয়োজনে বারেবারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও স্মরণ করেছেন।

কালকূটের কোনো রচনাতেই আমরা ব্যক্তি মানুষ সমরেশকে পুরোপুরি পাই না। তিনি খুব সচেতন ভাবেই নিজের কথা এড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁর ধারণা—

> ''...এদেশে জীবন স্মৃতিকারেরা কস্মিনকালেও, জীবনের অতি বাস্তব নির্মম, বিস্ময়কর, বেদনা বা আনন্দদায়ক অনেক কথাই লিখতে পারেননি। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' ছাড়া আজ পর্যন্ত এমন একটি জীবন স্মৃতি পেলাম না, যাতে করে স্মৃতিকারকে একটু স্পর্শ করতে পারি।... খালি তেল ঘি গরম মশলাতেই সব সারতে হবে? একটু নুন ঝাল টকের দরকার নেই? অন্ধকারই যদি নেই, তবে আলোর বিকাশটা বুঝি কেমন করে? সরল সত্য বলে কি কোনো কথা নেই?"[৫৩]

তবে তিন চারটি টুকরো রচনায় তিনি তাঁর জীবনের কিছু খণ্ড স্মৃতি তুলে ধরেছেন। এগুলির মধ্যে কোনো ধারাবাহিকতা নেই, সময়ের ব্যবধানও রয়ে গেছে। আয়তনে ছোট এমনি তিনটি রচনা হল— 'ভোটদর্পণ' (১৯৫২), 'গাহে অচিন পাখি' (১৯৭৫) ও 'অতিথি' (১৯৮৩)। এছাড়াও নাম করা যায় 'যুগ যুগ জীয়ে' নামক উপন্যাসটির, যেখানে তিনি নিজের চল্লিশের দশকের জীবনস্মৃতির কিছু টুকরো কথা অপেক্ষাকৃত বিশদাকারে বলেছিলেন। 'কালকূটের চোখে সমরেশ বসু' শীর্ষক রচনাটিতেও লেখক তাঁর জীবনের অনেক তথ্য উপহার দিয়েছেন। এই লেখাটি তিনি 'প্রসাদ' পত্রিকার সম্পাদক প্রণব বসুর সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে লিখেছিলেন তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়সে অসম্ভব ব্যস্ততার মধ্যে কালকূট তাঁর জীবন কাহিনি শোনাতে শুরু করেছিলেন 'প্রসাদ' পত্রিকার পাতায়। পাঁচ বছর ধরে 'প্রসাদ' পত্রিকায় (আগস্ট ১৯৭৩ - জুলাই ১৯৭৮) সমরেশের শৈশবের মাত্র সাড়ে তিন বছরের ইতিহাস তিনি লিখেছিলেন। তিনি নিজের অথবা অন্য কারও জীবনী লিখতে বসলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির পরিবার পরিজন-পরিবেশ সমাজ ও অর্থনীতি রাজনীতির সমগ্র পরিমণ্ডলকে নিয়ে ভাবেন।

এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে দেখতে চান। সেই কারণেই 'জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য' (১৯৮৭), 'যুগ যুগ জীয়ে' (১৯৮১) বা 'দেখি নাই ফিরে' (১৯৮৭) নিছক কোনো ব্যক্তির জীবন কাহিনি নয়। তিনি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিমাই, সমরেশ ও রামকিঙ্করকে কেন্দ্র করে তিনটি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের বিশদ ইতিহাস রচনা করেছেন। তাঁর জীবনভিত্তিক একটি উপন্যাস হলো 'চিরসখা', যেটি তাঁর ছেলে নবকুমার বসু রচনা করেন। লেখকের জীবনের বিচিত্র পর্বসমূহ বা চড়াই উৎরাই এখানে ফুটে ওঠে। উপন্যাসের শুরুতে বলা হয়— ''অজানা প্রতিভা আর অসামান্য সাহসে ভর করে শূন্য থেকে শিল্পের অচিন আর বন্ধুর পথে যাত্রা করেছিল এক স্বপ্ন সন্ধানী প্রায় যুবক..। দেশবিভাগের পূর্ববতী কালবেলায়।''[৫৪] সমরেশের শেষ ও অশেষ সৃষ্টি হলো 'দেখি নাই ফিরে' যা অসম্পূর্ণ থেকে গেল চিরকাল। তেমনি বোধহয় অসম্পূর্ণ থেকে গেল সেই মহান ভাস্কর শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ-এর পুনর্জন্ম। যার সঙ্গে জুড়ে ছিল লেখকের দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও তথ্য সংগ্রহ-এর প্রস্তুতি। লেখক প্রথমের দিকে ঠিক করেন রামকিঙ্করের জীবনী লিখবেন কিন্তু ক্রমশ ভাবনা চিন্তার পরিবর্তন তাঁকে জীবন অবলম্বন করে একটি সমগ্র উপন্যাস রচনায় উৎসাহিত করে। তাই একটু একটু করে জেনেছেন মানুষটার জীবনযাপন, এত বিখ্যাত শিল্পী হয়ে ওঠা, দুরন্ত সব সৃষ্টিকর্ম, রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসা এবং তারপর বাকি জীবনটা শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে দেওয়া। এই সব কিছুর মধ্যেই লেখক এমন একটা অ-সাধারণ বিশেষ মনুষ্যত্বকে খুঁজে পেয়েছেন যার তীব্র আকর্ষণ তিনি মনে মনে কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারেন নি। রামকিঙ্করের বহু বর্ণময় জীবনকে তিনি আরও জীবন্ত করে তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। এছাড়াও শিল্পী নন্দলাল বসুকে তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে সামগ্রিক মূল্যায়নের চেষ্টা করেছিলেন।

১৯৭৮ সালে সমরেশ যখন প্রথমবার তাঁর কাছে প্রস্তাব নিয়ে যান তখন রামকিঙ্কর বয়সে বৃদ্ধ, ক্লান্ত, অবসন্ন ও স্মৃতিও কিছু ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। 'দেশ'-এর সম্পাদক সাগরময় ঘোষের চিঠি পেয়ে তিনি সমরেশকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তবে মাঝখানে কিছু ব্যক্তির বাধাও সমস্যা সৃষ্টি করে। যাইহোক রামকিঙ্করকে তিনি জন্মভিটে বাঁকুড়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময় রামকিঙ্কর হাঁটতে চলতে একেবারেই অক্ষম। সমরেশের উদ্দেশ্য ছিল ছেলেবেলার পরিবেশ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু, পরিচিত জনেরা একসঙ্গে মিলিত হলে কী প্রতিক্রিয়া হয়।

বিভিন্ন বাধাবিঘ্নের মধ্যে ১৯৮০ সালে রামকিঙ্করের প্রয়াণ ঘটলে সমরেশের সৃষ্টি এক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায়। কিন্তু তাঁকে সফল হতে হলে প্রয়াত মানুষটার জীবদ্দশার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘটনা জানতে হবে। যার জন্য তিনি পরিচিত হতে লাগলেন তার পরিবেশ-পরিজন-প্রতিবেশীর সঙ্গে। তিনি অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠেছিলেন রামকিঙ্কর ও তাঁর রায়দিঘি গ্রামের এক সময়কার তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার ব্যাপরেও। রামকিঙ্কর সমাজের একেবারে নিচু স্তর থেকে উঠে আসা এক মানুষ, যিনি নিজস্ব প্রতিভাবলে শিল্পের সাম্রাজ্যে স্থান করে নিয়েছিলেন। সামান্য 'চণ্ডীনাপিতের ছেলে' রামকিঙ্কর তাই অনেকেরই ঈর্ষার কারণ হন। অন্যতম প্রতিভাবান শিল্পী হয়েও জীবনে অনেক অবিচার পেয়েছেন, যার বিরুদ্ধে এক শিল্পসম্মত প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেছিলেন সমরেশ। সমরেশ মনে করেন রামকিঙ্কর একজন জাত শিল্পী। বাঁকুড়ায় রামকিঙ্করের মতো চিত্রশিল্পী কেউ ছিল না। তবু সমরেশের ধারণা বাঁকুড়ার নারী পুরুষের মধ্যে শিল্পী প্রতিভা ছড়িয়ে ছিল, তারা ঘরে বসে পট আঁকতেন। এই পরিমণ্ডলেই রামকিঙ্করের বাল্যকাল কৈশোরকাল কেটেছে। মানুষটার পরিণত মানসিকতার পশ্চাৎপট এখানেই পাওয়া যায়। এই প্রকৃতির মধ্যেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তিনি ক্রমশ বেড়ে উঠেছিলেন। পরবর্তীতে রামকিঙ্করের জীবন-যাপন অনেকটাই এই শিল্প ভাবনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সমরেশের নিজেরও শৈশব থেকে আঁকার প্রতি আগ্রহ ছিল। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর আগ্রহের তালিকা অজস্র। যার জন্য পরিবার সদস্য থেকে সমাজের কাছে কম অপমান জোটেনি। তবুও এই বালক সারাজীবন বিপরীতের প্রতি টানকে অবজ্ঞা করতে পারেননি। ১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাসে, একটি মূল্যবান সাক্ষাৎকারে দিব্যেন্দু পালিত সমরেশের কাছে রামকিঙ্করকে শেষ লেখার বিষয় হিসাবে নির্বাচনের কারণ কী তা জানতে চেয়ে প্রশ্ন করেন, হয়তো তা রামকিঙ্করের সঙ্গে সমরেশের জৈবনিক সাদৃশ্যের কথা ভেবেই। এই প্রশ্নের উত্তরে সমরেশের উত্তর ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যথা—

> ''আমি নিজেই বিশেষ করে রামকিঙ্করের জীবন থেকে বুঝেছি যে আমার আর কোথাও কোনো সিদ্ধান্তই নেই। আমার একমাত্র সিদ্ধান্তই হচ্ছে সেইদিন যেদিন আমি নিজে যে শিল্প গড়তে চেয়েছি, সেদিকে যেতে পেরেছি।'[৫৫]

দুরন্ত উচ্চাশা আর প্রস্তুতির জাল বুনতে বুনতে দীর্ঘ যে উপন্যাস তিনি রচনা করতে চেয়েছিলেন, সেটা দিয়েই যেন তিনি তাঁর সৃষ্টির আকাশকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

মনে করেন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নয়নপুরের মাটি' ও শেষ লিখিত 'দেখি নাই ফিরে' উপন্যাস দুটির মধ্যে একটিতে চরিত্র মহিমের শিল্পী হয়ে ওঠার স্বাদ শেষ উপন্যাসে বহমান আবর্তন চক্রে পূর্ণতা পায়। সমরেশের শেষ ও শুরু সেই মাটির টানে। যেন এই দুটি রচনার মধ্য দিয়ে সমরেশের নিজের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার আর্তি মূর্ত হয়ে ওঠে।

তৎকালীন বাঁকুড়া ও শান্তিনিকেতনকে জীবন্ত তুলে ধরতে সমরেশ প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত তিনি তথ্য সংগ্রহ করতে বহুবার দিল্লি, বাঁকুড়া ও শান্তিনিকেতনে যাতায়াত করেছেন। এমনকি বাঁকুড়ার রাস্তাঘাট, দোকান-বাজার, দোলতলা, গন্ধেশ্বরী ঘুড়ে বেড়িয়েছেন তথ্য সংগ্রহ করতে। পাশাপাশি শিখেছেন বাঁকড়ি ভাষা, যার বিশেষ ব্যবহার আর অন্য কোন উপন্যাসে দেখা যায় না। সমরেশ বসুর লেখায় বাংলার একটি বিশেষ অঞ্চলের এবং তার অধিবাসীদের ও সাঁওতাল আদিবাসীদের চিত্রায়ণ ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিশ্বভারতী'র মূল্যায়নও এই জীবনোপন্যাসে আমরা চিত্রায়িত হতে দেখি। বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে সমরেশকে সাহায্য করেছেন রামকিঙ্করের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, যেমন—বাঁকুড়ার অবনী নাগ ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বামী বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বনবিহারী ঘোষ, রামকিঙ্করের শিষ্য শঙ্খ চৌধুরী প্রমুখ উৎসাহীরা।

কালকূট ও সমরেশ এই দুই সত্তার যেন মিলেমিশে গিয়েছে 'দেখি নাই ফিরে' উপন্যাসে। সর্বশেষ অসমাপ্ত এই কালজয়ী উপন্যাসটির আলোচনার প্রসঙ্গে সাগরময় ঘোষ বলেন—

> ''আমার মনে হয়, চলে যাওয়ার সময় এই কালজয়ী কীর্তির মাধ্যমে আরেকটি জিনিস জানিয়ে গেলেন, সমরেশ আর কালকূট অভিন্ন, এখানে এই দুই সত্তা শুধু হাত ধরাধরি করেই হাঁটেননি এর মাধ্যমেই ঘটেছে উভয়ের একাত্ম উত্তরণ।''[৫৬]

এই অধ্যায়ের শেষে এসে কালকূট ও সমরেশ বসুর তুলনা ও ঐক্য এই বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্তকে সূত্রাকারে সাজাতে পারি। লেখকের সৃষ্ট শিল্প ও সাহিত্যের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে কখনো অস্বীকার করার উপায় নেই কেননা এই ব্যক্তিসত্তার ভিত্তিতেই দাঁড়িয়ে থাকে লেখকসত্তা। এই ব্যক্তির জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির প্রকাশ ঘটে সাহিত্যে। একজন লেখকের মধ্যে ব্যক্তি ও লেখকের দ্বৈতসত্তা কখনো প্রচ্ছন্ন থাকে বা

কখনও আবার প্রকট হয়ে ওঠে। একই লেখকের মধ্যে একাধিক লেখক সত্তাকে দেখা যায়। কখনো কখনো সেই অভিজ্ঞতা এত বিচিত্র এবং বহুমুখী, কিংবা এমনই পরস্পর বিপরীতমুখী যে তার মধ্যে একই ব্যক্তি- লেখকের ব্যক্তিত্বকে ধরানো যায় না। ফলে লেখকের এই দ্বিমুখী বা বিচিত্রমুখী জীবনাভিজ্ঞতা ও জীবন প্রকাশ করতে লেখককে এক ব্যক্তি সত্তার আধারে দুই লেখক সত্তাকে গড়ে তুলতে হয়। নিজের এই দ্বৈত বা দ্বৈতাধিক সত্তা সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন থেকে দুই লেখক সত্তাকে গড়ে তোলেন। দুই সত্তাকে সম্পূর্ণ সচেতন ভাবেই আলাদা করে রাখেন। আমাদের মত যারা সাধারণ মানুষ—তারাও নিজের সত্তার দ্বৈত পরিচয় অনেক সময় অনুভব করি, কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাই না। তাকে পৃথক ভাবে গড়ে তোলার কথা ভাবি না। অনেক সময় নিজের নামে লেখকেরা অনেক কথা বলতে চান না—তাতে পাঠকের কাছে তাদের প্রতিষ্ঠিত লেখক সত্তায় আঘাত লাগতে পারে। এজন্য লেখকেরা নিজের ব্যক্তিবোধের ভিতরেই দুই পৃথক লেখককে গড়ে তোলেন। আর সমরেশ বসু তো 'ভোটদর্পণ' নামক রচনা লেখার সময় রাজনীতির অত্যন্ত আক্রমনাত্মক রূপ দেখে বিরক্ত হয়েই তাৎক্ষণিক ভাবে কালকূট নাম নিয়ে ছিলেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনের অংশীদার হয়ে তাঁর মনের মধ্যে যে ভাব সক্রিয় হয় তা হলো মানুষ সম্বন্ধে তার অপরাজেয়তা সম্বন্ধে প্রগাঢ় বিশ্বাস ও প্রবল আগ্রহ। তাঁর জীবনের এই প্রারম্ভিক পর্যায়ে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেই তিনি মানবিক বীরত্বের চরিত্রকে খুঁজে পেয়েছিলেন। এদের থেকেই বুঝেছিলেন শ্রম মানুষকে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে এবং মানুষকে আরো বেশি করে সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন করে তোলে। যে বুঝতে শেখে নিয়তিকে পরিবর্তন করা সম্ভব। আতপুর জগদ্দলে থাকাকালীন সমরেশ সামাজিক জীবনের বাস্তব সমস্যা থেকে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন সেই সমস্ত সমস্যাই তাঁর লেখায় শিল্প রূপ পেতে থাকলো। সমাজ ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে তাঁর সংগ্রাম উপন্যাসের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। সমবেশের প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলি যেমন—নয়নপুরের মাটি (১৯৫২), উত্তরঙ্গ (১৯৫১), বি.টি. রোডের ধারে (১৯৫২), শ্রীমতি কাফে (১৯৫৩), গঙ্গা (১৯৫৭) প্রভৃতি। আলোচ্য এই উপন্যাসগুলিতে লেখকের জীবন ভাবনার বিশেষ ধরণ প্রতিফলিত হয়। এই উপন্যাসগুলির প্রত্যেকটির মধ্যেই কাহিনির নায়কের প্রতিকূলতাকে জয় করার একটা প্রতিনিয়ত চেষ্টা লক্ষ করা। কখনও তা সফল হয়, কখনও ব্যর্থ হচ্ছে। এই সময়টাতে সমরেশের নিজের জীবনে, তাঁর কর্মস্থল আতপুর-জগদ্দলের সামাজিক জীবনে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল,

যে অভিজ্ঞতা ঘরে বাইরে তাঁকে বিপর্যস্ত করছিল সেই প্রতিকূল অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টাই যেন উপন্যাসগুলিতে দেখা যায়। 'উত্তরঙ্গ'-এ আমরা দেখতে পাই এককাল থেকে আরেক কালে যাত্রা ঘটছে। গল্পের নায়ক 'লখাই', লক্ষ্মীন্দর সিপাহী বিদ্রোহের এক পলাতক সিপাহী। এর মধ্যে দিয়ে লেখক দেশ ও জাতির প্রতি আদর্শবাদী ভালোবাসা ও ইংরেজ শক্তির প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণাকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। লখাই, দেশিয় রাজা ও রাণীর প্রতি সানুরাগ আনুগত্য নিয়ে ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার 'ভারতেশ্বরী' উপাধি গ্রহণে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে জমির নতুন আইনে বিপর্যস্ত বোধ হওয়া গ্রামবাসীদের চটকলের চাকরী নেওয়াকে সাধ্যমতো বাধা দেয় কিন্তু চটকলের প্রসারকে এবং তাদের অনিবার্য বৃত্তিবদলকে ঠেকাতে না পেরে হতাশায় ও যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়। তার চোখের সামনে ইংরেজদের নতুন জমি আইনে মহাজনের প্রতাপ বাড়তে থাকে ও জমি টুকরো-টুকরো হয়ে যায়। কাঁচামালের অভাবে সমস্ত জেলে-জোলা-কামার-তাঁতী সকলেই জমিতে নামতে চায়। 'বি.টি. রোডের ধারে' উপন্যাসে রয়েছে শ্রমিক সমাজের একটি স্বপ্ন। স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সুস্থ ও সুন্দরভাবে বাঁচার স্বপ্ন যা কায়েমী স্বার্থযুক্ত মহাজন, মিলমালিক আর কড়িওয়ালার হাতে নিঃশেষ হয়ে গেছে। সেই স্বপ্ন নতুন করে দেখেছিল বস্তিরই মধ্যে বসে, ব্যতিক্রমী এক বাড়িওয়ালা। যে নিজে একজন ক্ষেত মজুরের সন্তান। ভবঘুরে গোবিন্দ তার স্বপ্নের সার্থকতার জন্য লড়াইয়ে জীবন দিয়েছিলো। তার স্বপ্নকে সার্থকতা দিতে আসে গোবিন্দ শুধু একজন ভবঘুরে নয় সে একজন কর্মচ্যুত বেকার শিল্পী। লেখক এই দুজন মানুষের নেতৃত্বে বস্তির বাসিন্দাদের অস্বাস্থ্যকর জীবন ও পরিবেশকে বদলানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তা সফল হয়নি। 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসেও গ্রামীণ মানুষদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি একটি বহিরাগত চরিত্রকে সৃষ্টি করেন। সে সিপাই বিদ্রোহের সৈনিক। ইংরেজ রাজত্ব বিস্তারের রাজনীতি বোঝে। কিন্তু ইতিহাসের সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। অন্যদিকে গ্রামীণ একটি গোষ্ঠীজীবনের চিত্র সমৃদ্ধ উপন্যাস হলো 'গঙ্গা'। এখানেও দেখা যায় একটি বড় জীবনের ইশারা, প্রতিকূলতাকে জয় করার প্রবনতা। এখানে আমরা পাই মৎসজীবী সমাজের অলৌকিক সংস্কার। বিশ্বাসে আবিষ্ট নদী সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটা-টান-আবর্ত প্রভৃতি প্রকট ও গোপন বিপদের সঙ্গে তাদের অবিরত মৃত্যু সংগ্রাম ও প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুরহস্যের সমুখীন হওয়াটাই জীবন। বেগাবান জলস্রোত ও মনোস্রোতের প্লাবনের মধ্যে যে অত্যাজ্য সংস্কার দৃঢ় হয়ে আছে তাদের জীবন নীতির

মধ্যে নিবারণ মালো ও তার ছেলে বিলাস যেন তা মানতে চায় না। নিবারণ মালোর মৃত্যু হলেও সমস্ত ভয় ও কুসংস্কারকে উপেক্ষা করে বিলাস দক্ষিণে মাছ ধরতে যাওয়ার উদ্যোগী হয়। সে যেন পুরনো যুগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, প্রচলিত সমস্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ। 'গঙ্গা' প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে, স্বাধীনতা লাভের দশ বছরের মধ্যে। এই সময়টাতে নাগরিক যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাব গ্রামীণ সমাজে তেমন ভাবে ছড়িয়ে যায় নি। তাই বিংশ শতাব্দীর মধ্য সীমায় বসবাস করেও 'গঙ্গা'-র জেলেদের জীবনযাপন একটি অখণ্ড গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনেরই উদাহরণ স্বরূপ। এ পর্বের লেখায় সমরেশের মনে মানুষের উত্তরণবোধের একটি চেতনা কাজ করে গেছে। মানুষ তার পরিবেশ পরিপার্শ্বের ঊর্ধ্বে উঠবেই-এইরকম একটি ধারণা তাঁর সব লেখায় ফুটে উঠতে দেখি। এরকম ধারণা গড়ে ওঠার পিছনে তাঁর রাজনীতি থেকে পাওয়া শিক্ষা এবং ব্যক্তি জীবনের লড়াই করে ওঠার উদাহরণ কাজ করে থাকবে। আর সবার উপরে আছে মানুষের অপরাজেয়তা সম্বন্ধে স্বপ্নদর্শী লেখকের বিশ্বাস। ১৯৫৪ সালে কুম্ভমেলার প্রস্তুতি পর্বের ঘোষণা শুনে সমরেশ মেলায় যাবার কথা ভাবেন কুম্ভমেলায় কেন গেলেন, কীভাবে গেলেন—সে সব কথা বহু পরিচিত। কুম্ভমেলা থেকে ফিরে এসে লিখলেন 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'। সেটিই কালকূটের নামে ছাপা প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা-যা তাঁকে বিপুল জনপ্রিয়তা এনে দেয়। তারপর থেকেই তার দুই নামে দুরকম লেখা চলতে থাকে। ১৯৫৫ সালে 'কালকূট'-এর পাকাপাকি প্রতিষ্ঠা। ১৯৬৭ সালে 'কোথায় পাব তারে' — সে প্রতিষ্ঠাকে আরো ব্যাপ্তি এনে দেয়। ১৯৫৫ সালে কালকূট নামে লেখা 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' সম্বন্ধে ১৯৭৫ সালে বলতে গিয়ে সমরেশ নামের তাৎপর্য সম্বন্ধে লিখেছিলেন—তাঁর বুক ভরে আছে গরলে, আপনাকে খুঁজে ফেরা, আসলে সেই অমৃতকেই খুঁজে ফেরা। কেন গরলে বুক ভরে আছে তার কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা সমরেশ দেন নি। আমরা অন্যত্র তার কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ খুঁজে দেখেছি। এখানে পুনরুক্তির সম্ভাবনা মনে রেখেও বলতে পারি অন্য কারণ যাই থাক 'আপনাকে খুঁজে ফেরা' নিজেকে পাওয়া, নিজের কাজে নিজের সত্তাকে আবিষ্কার—তাই সম্ভবত 'অমৃত'। সেই খুঁজে ফেরা—নিজেকে পাওয়া সাধক সন্ন্যাসীর পাওয়া নয় লেখকের আত্মাবিষ্কার বহু মানুষের জীবন সায়রের অতলে তলিয়ে। ১৯৫৫-র পর থেকে এই ধারা—এই মানব জীবন সাগরে ডুবে, মানব জীবনের অতল থেকে সন্ধানী চোখ জীবনের সার্থকতা খুঁজে আনছে। দ্বিতীয় পর্বে সমরেশ লিখছেন 'বিবর' (১৯৬৫), 'প্রজাপতি (১৯৬৭),

‘স্বীকারোক্তি’ (১৯৬৭), ‘পাতক’ (১৯৬৯)-এর মতো সব উপন্যাস। যেখানে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে পঞ্চাশ দশকে একটি উদভ্রান্ত হতাশাগ্রস্ত এবং প্রায় বিশৃঙ্খল সমাজজীবনে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ, অবক্ষয়ের দিকে অবনমিত হচ্ছিল। ষাট দশকে যা অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মুদ্রাস্ফীতি, দারিদ্র্য, বেকারি, খাদ্যসংকট দ্বারা আরো প্রকট হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক অসদাচার ও নেতাদের স্বার্থ জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে। মিছিল, ধর্মঘট ঘেরাও, রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে শরিকি কলহ এবং বিস্ফোরণমুখী ছাত্র রাজনীতি, ষাটের দশককে যেন আরো বেশি উত্তাল করে তুলেছিল। এর আর এক দিকে ছিল স্থিতাবস্থার প্রতি নিষ্ঠা পুরানো জীবনাচরণে টান। সমরেশ এই সময়ে লিখিত উপন্যাসগুলিতে অত্যন্ত শাণিত ব্যঙ্গ তিক্ত ভাষায় দিয়ে এই পরিস্থিতিকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেন। যেখানে সমাজের পুরানো ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে রূপ পায়। আধুনিক উপন্যাসের এই পদ্ধতি যেখানে নায়ক তার স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে, চরিত্রের যন্ত্রণার মধ্যদিয়ে শুদ্ধ উপলব্ধিতে পৌঁছাতে চায়—এই ধারার সূচনা হয়েছে দস্তয়েফস্কির ‘ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেন্ট’ (১৮৬৬) উপন্যাসে। পাপবোধ, শাস্তি, স্বীকারোক্তি ও আত্মশুদ্ধির পথ দস্তয়েফস্কিই প্রথম দেখিয়েছেন। আধুনিক উপন্যাসের আরেকটি পদ্ধতি জীবন সত্যের অন্বেষণ যা আলব্যার কাম্যু-র ‘দি আউটসাইডার’ বা ‘দি স্ট্রেঞ্জার’-এ প্রথম পাওয়া যায়। এই দুটিরই অনুসরণ সমরেশের উপন্যাসগুলিতে ফুটে ওঠে। এই জটিল সময়েরই বহিঃপ্রকাশ তাঁর উপন্যাসে আমরা পাই। কিন্তু উপন্যাসগুলির জন্য তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হন। প্রকাশভঙ্গির অশ্লীলতার অভিযোগ ওঠে। ‘বিবর-প্রজাপতি-পাতক-স্বীকারোক্তি’ প্রভৃতি প্রত্যাশিত পাঠক সমাদর পায়নি। বরং বৃহত্তর পাঠক সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে তিনি আবার কালকূট ছদ্মনামে লেখেন ‘কোথায় পাব তারে’। ১৯৬৭-তে ‘দেশ’-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। যে আত্মসন্ধান ‘অমৃতকুম্ভের সন্ধানে’ উপন্যাসে শুরু ‘কোথায় পাব তারে’ উপন্যাসে তার বিস্তার। আগের লেখায় বলরামের গান ছিল তাঁর ভাব জগতে পৌঁছবার চাবি—এবারে সে ভূমিকা ‘গাজী’র। বলরামের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ট্রেনে গাজীর সঙ্গে দেখা নৌকায়, ধরণটা একই। গাজীর গানে এক অধরা রহস্যময় সত্তার দ্যোতনা ফুটে ওঠে। প্রকৃতি ও মানুষের জীবনের ভিতর থেকে সেই ‘তারে’ নামক এক অধরা সত্তার রহস্য বোঝার কাজ চলতে থাকে। সমরেশের বাস্তব ঘনিষ্ঠ জীবন সমালোচনা থেকে সরে কালকূটের মন অধরা

রহস্যের সন্ধান করে চলে। ষাট দশকে 'বিবর-প্রজাপতি-পাতক'-এ সমাজের মেকি মূল্যবোধের প্রতি প্রতিবাদের ভঙ্গি ছিলো অতি তীব্র ও শাণিত। সত্তরের দশকে লেখা 'অশ্লীল-অপদার্থ-বিশ্বাস' নামক উপন্যাসগুলিতে আপাত নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি আত্মনিন্দা দ্বারা পরোক্ষভাবে সমাজেরওপর তির্যক কটাক্ষ বর্ষণ করছে। আবার তিনি ছুটে যান পাহাড়-মেলা-প্রকৃতির কাছে। চেনা গণ্ডি ছাড়িয়ে অচেনা পরিসরে মানুষের বিচিত্র রূপে তিনি হন বিস্মিত ও আনন্দিত। সেই লক্ষ হৃদি সায়রে ডুব দেওয়ার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হতে থাকে ছদ্মনামে লেখা উপন্যাসগুলি। ১৯৭৭-এ সমরেশ নামে লেখা 'মহাকালের রথের ঘোড়া' উপন্যাসের নক্শালবাড়ি আন্দোলনের ব্যর্থতা দেখিয়েছেন। সত্তর দশকে রচিত 'মানুষ শক্তির উৎস', 'গন্তব্য' ও 'মহাকালের রথের ঘোড়া' উপন্যাসগুলি নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা হয়। আসলে এই নকশাল আন্দোলন সেইসময় মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিপ্লবের স্বপ্নকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল। এই আন্দোলনের পশ্চাদপটে যে দর্শন ছিল তার লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসাম্য দূরীকরণ। ভূমিহীন ক্ষেতমজুর, ভাগচাষীদের ওপর মহাজন জোতদারের শোষণ, দেশের আর্থিক কাঠামোর অসাম্য, ক্ষমতাবান মানুষদের হাতে তথাকথিত নিম্ন শ্রেণির মানুষদের পীড়ন, আন্দোলন দমনের ক্ষেত্রে পুলিশি অত্যাচার এ ছিল তার বহিঃপ্রকাশ। শুধুমাত্র আন্দোলনের মূল ক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্য-শিল্প-সমাজদর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই নক্শালবাড়ি আন্দোলন এক নব উদ্দীপনা এনেছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত কিছু প্রয়োগগত ভ্রান্তির কারণে তাতে ব্যর্থতা দেখা দেয়। যা সমরেশ তাঁর নায়ক চরিত্রের মধ্যেও দেখান। অন্য দিকে 'বিজন বিভুঁই' উপন্যাসে আধুনিক মানুষের নিঃসহায় নিরবলম্ব অবস্থার ভীতিপ্রদ ও সকরুণ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। একদিক থেকে দেখলে সমরেশ নামের উপন্যাসে সমাজ-রাজনীতি প্রথা পরিস্থিতির সঙ্গে সমর; আর জগৎ ও জীবনের এই সমরে বাস্তবে পরাজিত নায়কের মনে যে গ্লানির বিষ জমে ওঠে তারই গরল মোচন কালকূটের লেখায়। ১৯৫৪ থেকে কালকূট সমরেশ প্রায় পাশাপাশি চলেছেন। সমরেশ দেখেন তাঁর পরিপার্শ্ব—তাঁর চারিদিকের মানুষ ও মানুষের জীবন। কালকূটের দৃষ্টি দূর বিসর্পী; পুরাণ-ইতিহাস-ঐতিহ্য-লোক বিশ্বাস এসব কালকূটের বিষয়। তাঁর ভৌগোলিক ভ্রমণ এক সময় মানসিক ভ্রমণ হয়ে পুরাণ ইতিহাসের অন্তর্লোকে ঢুকে পড়ে। সেও ভ্রমণ; তবে সেখানে তিনি কেবল ঔপন্যাসিক নন ইতিহাস প্রাগিতিহাসও পুরাণের জগতে ঘুরে বেড়াতে আনন্দ

পান। সেখান থেকে নিজের প্রাচীন ঐতিহ্য নির্মাণ করতে চান। আর বাস্তবের লড়াই-এ তার নায়ক-নায়িকারা হেরে গেলেও সেই হার মানাটাকে কোনোদিন তিনি স্বীকার করেননি। লড়াইটা চলতে থাকে। কখনো হয়তো পুরানোর সামান্য উল্লেখ থেকে লড়াই-এর নূতন ইন্ধন নিয়ে জিতিয়ে দেয় সমবেত মানুষের লড়াইকে। সমরেশ বসু রাজনীতি ছেড়েও ছাড়তে পারেন না। কালকূটের রাজনীতির সংসর্গ না থাকেলও সমবেত মানুষের একাগ্র সাধনার দ্বারা জয় অর্জিত হয়। এই প্রচেষ্টার দেখা পাওয়া যায়—'শাম্ব' (১৯৭৮), 'প্রাচেতস' (১৯৮৪), 'পৃথা' (১৯৮৬) নামক উপন্যাসে। তিনটি উপন্যাসেরই কেন্দ্রীয় চরিত্রর মধ্যে দিয়ে কালকূট বিরুদ্ধ পরিস্থিতি থেকে মুক্তিকামী মনের উত্তরণের প্রয়াসকে, সফলতার প্রয়াসকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। যারা শত দুঃখে কিম্বা যন্ত্রণা বা অভিশাপে হেরে যাচ্ছে না বরং সেই জটিল পরিস্থিতি থেকে নিজেকে বের করার চেষ্টা করছে। আসলে তিনি যে নামেই লিখুন না কেন তাঁর লেখার মধ্যে একজন সংগ্রামী মানুষের সমস্ত প্রতিকূলতা বা বিরুদ্ধ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা কিম্বা সফল হওয়ার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়।

তথ্যসূত্র :

১. 'নিজেকে জানার জন্যে'—সমরেশ বসু, নিজেকে জানার জন্যে (প্রবন্ধ-নিবন্ধ সমগ্র), সম্পাদনা—ঝুমা রায়চৌধুরী, পূর্বাশা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১৩-১৪।

২. সমরেশ বসু : স্মরণ সমীক্ষণ — সম্পাদনা সত্যজিৎ চৌধুরী ও অন্যান্য, জীবনপঞ্জী, চয়ণিকা, ১৯৯৪, পৃ.৫৬৮।

৩. সমরেশ বসু : ব্যক্তি লেখক—ভূমিকাংশ, সমরেশ বসু রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭, জানুয়ারি।

৪. 'প্রসঙ্গ ভারতীয় কমিউনিস্ট (অখণ্ড) পার্টি ও আমি'—সমরেশ বসু, নিজেকে জানার জন্যে (প্রবন্ধ-নিবন্ধ সমগ্র), সম্পাদনা—ঝুমা রায়চৌধুরী, পূর্বাশা, জানুয়ারি ২০১৩,পৃ. ১১৯।

৫. সমরেশ বসু : ব্যক্তি ও লেখক—ভূমিকাংশ, সমরেশ বসু রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭, জানুয়ারি।

৬. 'প্রসঙ্গ ভারতীয় কমিউনিস্ট (অখণ্ড) পার্টি ও আমি'—সমরেশ বসু, নিজেকে জানার জন্যে (প্রবন্ধ-নিবন্ধ সমগ্র), সম্পাদনা—ঝুমা রায়চৌধুরী, পূর্বাশা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১২৭।

৭. ঐ।

৮. ঐ।

৯. পূর্বোক্ত—পৃ. ১২৬।

১০. 'নিজেকে জানার জন্যে'—সমরেশ বসু, নিজেকে জানার জন্যে (প্রবন্ধ-নিবন্ধ সমগ্র), সম্পাদনা ঝুমা রায়চৌধুরী, পূর্বাশা, পৃ. ১৬, জানুয়ারি ২০১৩।

১১. 'কেন গান্ধী'—সমরেশ বসু, নিজেকে জানার জন্যে (প্রবন্ধ-নিবন্ধ সমগ্র), সম্পাদনা—ঝুমা রায়চৌধুরী, পূর্বাশা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১৩৮।

১২. 'সাহিত্য করার আগে'—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখকের কথা, পৃ. ১৫, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা: লি:, সেপ্টেম্বর ১৯৫৭।

১৩. কালের প্রতিমা—অরুণ মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৫, পৃ. ১৫২।

১৪. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, নভেম্বর, ২০০৩, পৃ. ২৪০।

১৫. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৪১।

১৬. 'প্রসঙ্গ ভারতীয় কমিউনিস্ট (অখণ্ড) পার্টি ও আমি'—সমরেশ বসু, নিজেকে জানার জন্যে (প্রবন্ধ-নিবন্ধ সমগ্র), সম্পাদনা—ঝুমা রায়চৌধুরী, পূর্বাশা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১২৫।

১৭. পূর্বোক্ত—পৃ. ১২৬।

১৮. পূর্বোক্ত—পৃ. ১২৮।

১৯. পূর্বোক্ত—পৃ. ১২৯।

২০. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৩৭।

২১. 'নিজেকে জানার জন্যে'—সমরেশ বসু, নিজেকে জানার জন্যে (প্রবন্ধ-নিবন্ধ সমগ্র),

সম্পাদনা—ঝুমা রায়চৌধুরী, পূর্বাশা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১৭,

২২. প্রসঙ্গ ভারতীয় কমিউনিস্ট (অখণ্ড) পার্টি ও আমি'—সমরেশ বসু—নিজেকে জানার জন্যে (প্রবন্ধ-নিবন্ধ সমগ্র), সম্পাদনা ঝুমা রায়চৌধুরী, পূর্বাশা, জানুয়ারি, ২০১৩, পৃ. ১৩৫,

২৩. পূর্বোক্ত— পৃ. ২১।

২৪. পূর্বোক্ত।

২৫. সমরেশ বসু রচনাবলী—প্রথম খণ্ড, ভূমিকাংশ, 'দুই', সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশিং, ১৯৯৭।

২৬. নিজেকে জানার জন্যে—সমরেশ বসু—নিজেকে জানার জন্যে (প্রবন্ধ-নিবন্ধ সমগ্র), সম্পাদনা ঝুমা রায়চৌধুরী, পূর্বাশা, জানুয়ারি, ২০১৩, পৃ. ২৫।

২৭. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত—সমরেশ বসু রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, ভূমিকাংশ-'দুই', আনন্দ পাবলিশিং, ১৯৯৭।

২৮. নিজেকে জানার জন্যে—সমরেশ বসু—নিজেকে জানার জন্যে (প্রবন্ধ-নিবন্ধ সমগ্র), সম্পাদনা ঝুমা রায়চৌধুরী, পূর্বাশা, জানুয়ারি, ২০১৩, পৃ. ২৬।

২৯. কালকূট রচনা সমগ্র— প্রথম খণ্ড, 'গাহে অচিন পাখি', কালকূট—ড. নিতাই বসু সম্পাদিত, মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ৪০।

৩০. 'প্রথম আত্মবিশ্বাস'—সমরেশ বসু, নিজেকে জানার জন্যে (প্রবন্ধ-নিবন্ধ সমগ্র), সম্পাদনা—ঝুমা রায়চৌধুরী, পূর্বাশা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৩৪।

৩১. 'আমার সাহিত্য জীবন'—সমরেশ বসু, নিজেকে জানার জন্যে (প্রবন্ধ-নিবন্ধ সমগ্র), সম্পাদনা—ঝুমা রায়চৌধুরী, পূর্বাশা, জানুয়ারি ২০১৩,পৃ. ২৯।

৩২. গাহে অচিন পাখি—কালকূট কালকূট রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড, ড. নিতাই বসু সম্পাদিত, মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ৪১।

৩৩. পূর্বোক্ত।

৩৪. 'আমার সাহিত্য জীবন'—সমরেশ বসু, নিজেকে জানার জন্যে (প্রবন্ধ-নিবন্ধ সমগ্র), সম্পাদনা—ঝুমা রায়চৌধুরী, পূর্বাশা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ২৯।

৩৫. কেন লিখি, না কেন লেখো—সমরেশ বসু, নিজেকে জানার জন্যে (প্রবন্ধ-নিবন্ধ সমগ্র),

সম্পাদনা—ঝুমা রায়চৌধুরী, পূর্বাশা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১৭৩।

৩৬. গাহে অচিন পাখি—কালকূট, কালকূট রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড, নিতাই বসু সম্পাদিত, মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ৪৭।

৩৭. কালকূট সমরেশ—নিতাই বসু, জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স, ১৩৯৪, ১লা বৈশাখ, পৃ. ১০২।

৩৮. গাহে অচিন পাখি—কালকূট, কালকূট রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড, নিতাই বসু সম্পাদিত, মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ৩৯।

৩৯. পূর্বোক্ত—পৃ. ৪০।

৪০. আমার সাহিত্য জীবন—নিজেকে জানার জন্য (প্রবন্ধ নিবন্ধ সমগ্র)—সম্পাদনা—ঝুমা রায়চৌধুরী—পূর্বাশা, জানুয়ারী, ২০১৩, পৃ. ৩০।

৪১. স্থানে কালে : কালকূট (১)—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালকূট রচনা সমগ্র, অষ্টম খণ্ড, সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত, ১৩৯৩, ফাল্গুন, ১৯৮৭, মার্চ।

৪২. স্থানে কালে : কালকূট (২)—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালকূট রচনা সমগ্র, অষ্টম খণ্ড, সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত, ১৩৯৩, ফাল্গুন, ১৯৮৭, মার্চ।

৪৩. কালকূট রচনা সমগ্র, অষ্টম খণ্ড, গ্রন্থ পরিচয়—অমৃত কুম্ভের সন্ধানে—বিচিত্র, কালকূট—ড. নিতাই বসু সম্পাদিত, পৃ. ৩৬৭১, ২০০৯।

৪৪. কালকূট : অন্তঃহীন অন্বেষণ—স্নেহাশিস ভট্টাচার্য, পৃ. ১০৪, পত্রলেখা, জানুয়ারি ২০০৮।

৪৫. খেলছে মানুষ দেখগে তোরা—কালকূট, কালকূট রচনা সমগ্র, সপ্তম খণ্ড, নিতাই বসু সম্পাদিত, মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ৩২৩১।

৪৬. অমৃত পথের যাত্রী—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, 'শব্দ' সাহিত্য পত্রিকা, কালকূট বিশেষ সংখ্যা, সংখ্যা : তৃতীয়, ২০১১, জানুয়ারি, পৃ. ২৭।

৪৭. 'দাহ এবং দ্রোহ'—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকাংশ (এক), সমরেশ বসু রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি, ২০০০।

৪৮. আমার সাহিত্য জীবন—সমরেশ বসু, নিজেকে জানার জন্যে (প্রবন্ধ-নিবন্ধ সমগ্র), পূর্বাশা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ২৯।

৪৯. পূর্বোক্ত—পৃ. ৩০।

৫০. 'দাহ এবং দ্রোহ'—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকাংশ (তিন), সমরেশ বসু রচনাবলী,

চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০০০।

৫১. পূর্বোক্ত।

৫২. আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস—অশ্রুকুমার শিকদার, অরুণা প্রকাশনী, জুলাই ১৯৮৮, পৃ. ৩১৪।

৫৩. কালকূটের চোখে সমরেশ বসু—কালকূট, কালকূট রচনাসমগ্র, অষ্টম খণ্ড, মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ৩৫৮৩।

৫৪. চিরসখা—নবকুমার বসু, আনন্দ পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০০৯।

৫৫. সমরেশ বসু : অর্জিত অভিজ্ঞান (এক)— সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুন ২০০০।

৫৬. দেখি নাই ফিরে— সমরেশ বসু, ভূমিকাংশ, সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স, ডিসেম্বর, ১৯৯২।